প্রিয়তমা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য রূপা
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭

কলকাতার শহরতলি।

এখন আর দেখলে চেনা যায় না। সবই যেন কলকাতা শহরের সামিল হয়ে গেছে।

কিন্তু কিছুদিন আগে এই সব জায়গা ঝোপ-জঙ্গলে ভর্তি, ধানের মাঠ, আর কচুরিপানার ডোবা।

এখন আর সে ডোবাও নেই, ধানের মাঠও নেই। গাছপালা ঝোপ-জঙ্গল এখানে কোনোদিন ছিল বলে মনে হয় না। সে-সব দৃশ্য চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তার জায়গায় উঠেছে ভাল ভাল বাড়ী, বড় বড় পথ, ইলেকৃট্রিকের আলো, সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করবার জন্যে মানুষের যা একান্ত প্রয়োজন—সবকিছু।

মানুষের এত এত প্রয়োজনের মাঝখানে ওই যে চমৎকার বাড়ীখানি দেখছেন, ওটারও কি প্রয়োজন ছিল?

না প্রয়োজন ছিল মিসেস্ সারখেলের?

মিসেস্ সারখেল দেখতে সুন্দরী নন, বয়স যে কত চোখে দেখে তা অনুমান করা যায় না। তবে তিরিশ পেরিয়েছে সেকথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে। সব সময়েই ফিট্‌ফাট্, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, চোখে চশমা, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। কথাগুলি ভারি মিষ্টি।

মিসেস্ সারখেল বাঙ্গালী।

কিন্তু হিন্দীতে কথা যখন বলেন তখন মনে হয় হিন্দুস্থানী। ইংরাজীও বলেন চমৎকার। আর কি কি ভাষা জানেন আমাদের জানা নেই। লোকজনের সঙ্গে মেশেন খুব কম। দিবারাত্রি নিজের কাজ নিয়েই থাকেন। পায়ে হেঁটে চলতে তাঁকে বড়-একটা দেখা

যায় না। সব সময়েই দেখি হয় ট্যাক্সি নয়ত' রিক্সা চড়ে যাওয়া-আসা করছেন মিসেস্ সারখেল।

স্বামী ছিলেন ডাক্তার সারখেল। পশ্চিম পাকিস্তানের কোন্ একটা শহরে ডাক্তারী করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর মিসেস্ সারখেল সেখান থেকে কলকাতায় চলে এসেছেন।

ছেলেপুলে নেই, তবে জনপ্রবাদ নাকি মিসেস্ সারখেলের টাকা আছে। বাড়ীখানা নিজের।

কি কাজ তিনি করেন তার সঠিক খবর কেউ জানে না।

জানবার প্রয়োজনও কেউ বোধ করে না।

উড়ো খবর যেটুকু পাওয়া গেছে—তাতে কেউ বলে বাড়ীখানা নার্সিং হোম্। কেউ বলে—নারীরক্ষা সঙ্ঘের বাড়ী।

এইবার আসল কথাটা বলি।

নারীরক্ষা সঙ্ঘই হবে হয়ত'।

সেদিন রাত্রি তখন প্রায় ন'টা, একটি রিক্সা এসে দাঁড়ালো এই বাড়ীটার সামনে।

রিক্সা থেকে নামালো একটি মেয়ে আর একটি পুরুষ। মেয়েটির পরণে নিতান্ত সাধারণ জামা কাপড়, পায়ে জুতো নেই, তবে গায়ের রংও যেমন, চেহারাও তেমনি। যুবতী তো বটেই, সুন্দরীও বলা চলে।

সঙ্গে যে-লোকটি রয়েছে তার নাম দীনবন্ধু সরকার। লোকটা যেমন লম্বা, তেমনি রোগা। কিন্তু চাল-চলন দেখলে অসুস্থ বলে মনে হয় না। মিসেস্ সারখেলের খুব পরিচিত ব্যক্তি। বাড়ীর চাকরটাও তাকে নমস্কার করলে।

দীনবন্ধু মেয়েটিকে নিয়ে মিসেস্ সারখেলের কাছে গিয়ে বললে, আবার এসেছি গো মা। এবার এসেছি পুরুলিয়া জেলার ছোট একটি গ্রাম থেকে।

সারখেল ভাল করে দেখলেন মেয়েটিকে।

তা হ্যাঁ, দেখবার মত চেহারা সত্যি।

—কি নাম তোমার?

মেয়েটি বললে, আমার নাম বীণা।

সারখেল এবার ঘর থেকে সরিয়ে দিলেন দীনবন্ধুকে।—যাও তুমি রান্নাঘরে গিয়ে বাম্‌নীকে বল—তোমরা দু'জন খাবে আজ রাত্রে।

যাবার আগে দীনবন্ধু বললে, আমার যে কিছু কথা ছিল গো তোমার সঙ্গে।

সারখেল বললেন, পরে শুনবো। আগে দেখি তোমার রুগীটি কেমন।

দীনবন্ধু বললে, ব্যামো একটু শক্ত। ভাল ভাল ওষুধ দিয়ে দিনকতক্ চিকিচ্ছে করতে হবে।

—তা হোক। তুমি যাও।

সারখেল বীণাকে আদর করে বসালেন নিজের পাশে। বললেন, কে আছে বাড়ীতে?

বীণা বললে, দাদা আর বৌদিদি আর তাদের চারটে ছেলেমেয়ে।

—এখানে কি জন্যে এসেছো—দীনু বলেছে তো তোমাকে?

বীণা মুখ টিপে হেসে মুখ নামিয়ে চুপ করে রইলো।

—কি জন্যে এসেছ বল, চুপ করে রইলে কেন?

বীণা বললে, দীনুদা আমাকে কালীঘাট দেখাবে। তারপর—তারপর—

বাস্, তারপর বলেই আবার সেই সলজ্জ হাসি। হেসে বললে, আমি বলতে পারবো না। দীনুদাকে জিজ্ঞাসা কোরো।

প্রথমেই 'তুমি'। একেবারে গ্রাম্য মেয়ে।

—লেখাপড়া শিখেছো ?

—না। শিখবো কেমন করে ? দাদার ছেলে-মেয়ে মানুষ করেছি আর ভাত রেঁধেছি দুবেলা—সময় কোথায় পেলাম ?

—আবার ফিরে সেইখানে যেতে চাইবে না তো ?

বীণা বললে, আবার ? তাই আবার যায় নাকি ? সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি তো !

—বিয়ে হয়েছে ? সিঁথিতে সিঁদুর দেখছি না যে !

—এ মা ! সিঁদুর পরবো কি গো ! আমি যে বিধবা।

—কখন বিয়ে হয়েছিল ?

—কখন বিয়ে হয়েছে জানিই না। আট বছর বয়েসে বিয়ে হয়েছিল। বাস্, ছ'মাস যেতে না যেতেই বিধবা !

—এখন তোমার বয়েস কত ?

—তা এককুড়ির বেশেই হবে।

—ভাল।

সারখেল তাকে আর-একবার নিরীক্ষণ করে বললেন, তোমার বিয়ে দেবো আমরা।

বীণা বললে, জানি।

—জানো ?

—হ্যাঁ, দীনুদা বলেছে, সে আমাকে বিয়ে করবে।

সারখেল বললেন, না না তোমার দীনুদার চেয়ে অনেক ভাল ছেলে আমি দেবো। দীনুর তো অনেক বয়েস।

—তা হোক। আর কাউকে বিয়ে আমি করতে পারবো না। আমি খারাপ মেয়ে নই।

সারখেল বুদ্ধিমতী মেয়ে। এ-সব দিকে তাঁর অভিজ্ঞতাও কম নয়! বুঝতে তিনি সবই পারলেন! নিতান্ত অশিক্ষিতা পাড়াগাঁয়ের এই মেয়েটিকে বুঝিয়ে বাগ মানাতে বেগ একটু পেতে হবে তাঁকে।

সারখেল ডাকলেন, অন্নপূর্ণা!

মাঝ-বয়েসী একজন ঝি এসে দাঁড়ালো।

—একে কলঘরে নিয়ে যা।

বীণাকে বললেন, হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে আজকে বিশ্রাম কর। কাল সব ব্যবস্থা করে দেবো।

এই বলে তিনি বীণাকে কল ঘরে পাঠিয়ে দীনবন্ধুকে ডাকালেন।

খাতা কলম বের করে বীণার নাম, ধাম, গ্রাম, গোত্র দীনবন্ধুর যতটুকু জানা আছে—সবই তিনি লিখে নিলেন, তারপর দীনবন্ধুর পাওনা টাকা মিটিয়ে দিয়ে মিসেস্ সারখেল বললেন, এবার কিন্তু একশ' টাকা দেওয়া তোমাকে উচিত হলো না। আরও কম দিতে হতো।

দীনবন্ধু বললে, কেন মা?

সারখেল বললেন, ভারি বেয়াড়া মেয়ে। ওর পেছনে আমাকে অনেক খাটতে হবে।

--কিন্তু চেহারাটি কেমন! বড়লোকের লেখাপড়া জানা মেয়েদের হার মানিয়ে দেয়।

সারখেল ভাল করে বুঝিয়ে বললেন দীনবন্ধুকে। বললেন, তুমি আমার পুরনো লোক দীনবন্ধু। সবই তুমি জানো। যে-সব মেয়ের গায়ে হাত দিলে সতীত্ব চলে যায় সেরকম সেকেলে মেয়েদের নিয়ে আমার কাজ চলে না।

দীনবন্ধু বললে, সবই জানি মা। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের আন্‌কোরা মেয়েরা এমনিই সব। খারাপ কি আর সহজে কেউ হতে চায়? অনেক জ্বালায় জ্বলে অনেক দুঃখু পেয়ে এই পথে পা বাড়ায়। তার ওপর আমার কি কম ভয় নাকি? লোকজনের ভয়—পুলিশের ভয়। মেয়েটার পেছনে আমি লেগে আছি সে কি আজ থেকে নাকি? সে সব অনেক কথা মা, বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে।

সারখেল বললেন, থাক আর আমার মহাভারত শুনে কাজ নেই। আজকের রাতটা তুমি ওকে নিজের কাছে রাখো। বেশ ভাল করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বল। তারপর তুমি চলে গেলে আমি দেখে নেবো। খুব ভাল মক্কেল আছে আমার হাতে।

সেই ব্যবস্থাই হলো।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে দীনবন্ধুর ঘরেই রইলো বীণা।

দীনবন্ধু বললে, এমনটি কখনও দেখেছিস ?

বীণা বললে, কলকাতা কখনও আসিইনি তো দেখবো কেমন করে ?

—দ্যাখ্ দ্যাখ্, আরও কত দেখবি।

বীণা জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা দীনুদা, তুমি তখন ওই মেয়েটির কাছে আমাকে রুগী বললে কেন ?

—বলতে হয়। কেউ তোকে জিজ্ঞাসা করলে বলবি—আমার অসুখ করেছে তাই ডাক্তার দেখাতে এসেছি কলকাতায়।

—আমার তো অসুখ করেনি। ডাক্তার কিজন্যে দেখাবো ?

দীনবন্ধু বললে, তুই সে-সব বুঝবি না। অসুখ দু'রকম। এক দেহের, আর এক হচ্ছে গিয়ে মনের। তোর মনের অসুখ করেছে। তারই চিকিচ্ছে দরকার।

বীণা ভাবলে বুঝি দীনুদা তার সঙ্গে রসিকতা করছে। বললে, যাঃ !

দীনবন্ধু বললে, যাঃ নয়—সত্যি। ওই যে মিসেস্ সারখেল্‌কে দেখলি—ও একটা হেঁজিপেজি মেয়ে নয়। মস্ত বড়লোক। মেয়ে-ডাক্তার। এই যে এ-বাড়ী ওর নিজের।

—তা তো বুঝতেই পারছি। বীণা বললে, বল না গো আমার কি অসুখ করেছে। মনের অসুখ—কি রকম ?

দীনবন্ধু তখন বীণাকে বুঝাতে আরম্ভ করলে। বললে, মানুষ আজকাল যত লেখা পড়া শিখছে ততই বুঝতে পারছে। আগেকার দিনে তোদের মত সব জন্তু-জানোয়ার জন্মেছিল, তারা শুধু কেঁদেকেঁদে মরেছে আর সারাজীবন দুঃখু পেয়েছে। এই ধর্‌না—তোর অবস্থাটা বিয়ে যখন হয়েছিল তখন তোর জ্ঞান হয়নি। তোর দাদার দরকার ছিল টাকার। নগদ পাঁচশ' টাকা হাতে পেয়ে জেনেশুনে একটা থাইসিস্ রুগীর সঙ্গে তোর বিয়ে দিলে। ছ'মাস পেরোতে না পেরোতে লোকটা মরে গেল। তার সঙ্গে তো তুই ঘরও করলি না, স্বামী যে কি বস্তু তুই জানলি না বুঝলি না—বিধবা হয়ে বসে রইলি। সমাজ বললে কি না—তোর আর বিয়ে করার জো নেই। অথচ তুই বড় হলি, শরীরে যৌবন এলো। তোর বয়েসী মেয়েদের স্বামী দেখলে সংসার দেখলে ছেলেমেয়ে দেখলে, তোর বুকের ভেতরটা হা-হা করতে লাগলো। তবু তোর কিছু করবার জো নেই। আর মাংস পেঁয়াজ ছোঁয়ার উপায় নেই। একবেলা খেতে হবে, দুঃখু-কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। তোর দেহের খিদে মিটলো না, মনের খিদে মিটলো না। এই কি মানুষের জীবন নাকি? আজকাল লেখাপড়াজানা মেয়েদের দিকে তাকিয়ে ছাখ্। দেখবি তাদের সঙ্গে তোদের কত তফাৎ। এইটিই হলো তোর রোগ। এর চিকিচ্ছে দরকার।

বীণা এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিল দীনুর কথাগুলো। এইবার জিজ্ঞাসা করলে, কি করতে হবে আমাকে? ওষুধ খেতে হবে?

হো-হো করে হেসে উঠলো দীনবন্ধু। বললে, না না ওষুধ খেতে হবে না। তোর এই দেহ দিয়ে মনের রোগের চিকিচ্ছে করতে হবে।

—সে আবার কি রকম?

দীনবন্ধু বললে, ওই যে মিসেস্ সারখেল্—উনি তোকে বুঝিয়ে দেবেন।

মিসেস্ সারখেল্ যে কারও নাম হতে পারে বীণা তা জানতো না। বললে, ও আবার কিরকম নাম ? সরখোল্।

—না না সরখোল্ নয়—ওঁর স্বামীর উপাধি ছিল সারখেল্, তাই ওঁর নাম মিসেস্ সারখেল্। তোকে ও-সব কিছু বলতে হবে না। তুই ওঁকে দিদিমণি বলে ডাকবি।

—তারপর ?

তারপর ধর্ দিদিমণি চাইবে তোর মনের খিদে মিটিয়ে দিতে। চাইবে তুই যাতে সুখে থাকিস্ সেই ব্যবস্থা করতে। তার জন্যে প্রথমেই চাই তোর দেহের খিদে মেটানো। চাই এইটি তোর মনের মতন মানুষ।

বীণা বললে, বা-রে, তুমিই তো রয়েছ। তুমিই তো আমাকে বিয়ে করবে। আবার মনের মতন মানুষ কি হবে ?

দীনবন্ধু বললে, এই দ্যাখ—এইটিই তোরমনেররোগ। আমিবিয়ে করবো বলেছিলাম সত্যি। কিন্তু মিসেস্ সারখেল্ আমাকে বক্‌ছে। বলছে—তোমার লজ্জা করে না ? ওই তো তোমার হাড়-জিরজিরে চেহারা, তুমি ওই সুন্দরী মেয়েটাকে বিয়ে করবেবলছো কেমন করে ?

বীণা বললে, হেই মা, তাই আবার হয় নাকি ? আমি আবার ক'জনের সঙ্গে—ধেৎ, আমি কি খারাপ মেয়ে ?

দীনবন্ধু দেখলে বীণা মুখের কথায় বুঝবে না কিছুতেই। একাধিক পুরুষের সংস্পর্শে সে আসতে চাইবে না। অথচ মিসেস্ সারখেল্ এনেছেন তাকে সেই উদ্দেশ্যেই।

সারখেলের কাজ সারখেল্ করবেন। দীনবন্ধু দেখলে তার কাজ সে করে ফেলেছে। পারিশ্রমিকও সে পেয়ে গেছে। এখন বীণাকে না জানিয়ে এখান থেকে পালাতে পারলেই তার ছুটি।

দীনবন্ধু বললে, সারাদিন ট্রেনে এসেছিস্, তোর ঘুম পায়নি ?

—পেয়েছে তো।

—তাহলে শুয়ে পড়্।

দীনবন্ধুর সঙ্গে শুতে তার লজ্জা নেই। বীণা জড়োসড়ো হয়ে তার পাশেই শুয়ে পড়লো। বললে, তাহ'লে ওই কথাই রইলো তো? আমি আর কারও কাছে যেতে পারবো না। হ্যাঁ, এই কথা আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি। তুমি ওই সারখেল দিদিমণিকে বলে দিও। তা যদি করে তো আমি কেঁদে-কেটে একশা করবো। পালিয়ে যাব এখান থেকে।

দীনবন্ধু বললে, আচ্ছা তাই হবে। এখন তুই ঘুমো।

—ঘুম পাচ্ছে না।

দীনবন্ধু তাকে কাছে টেনে এনে বললে, নে তবে আমার পিঠে সুড়সুড়ি দে।

তাই সে দিতে লাগলো। চার গাছা করে সোনার চুড়ি ছিল বীণার হাতে। সেই চুড়িগুলো দীনবন্ধুর পিঠে লাগছে। সোনার বলতে এই চুড়ি-আটগাছিই ছিল তার একমাত্র সম্বল। গ্রাম থেকে আসবার সময় সেগুলি সে পরে এসেছে।

দীনবন্ধুর হঠাৎ মনে হলো—বীণার সঙ্গে সব সম্বন্ধ চুকিয়েই যখন সে চলে যাচ্ছে, তখন ভাল করেই যাওয়া দরকার।

সেই ব্যবস্থাই সে করলে।

সত্যিই বীণার মতন এমন সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী মেয়ে পাওয়া দুর্লভ। মিসেস্ সারখেল্ অনেক টাকা রোজগার করতে পারবেন।

বাইরে কোথায় যেন একটা পেটা-ঘড়িতে ঢং-ঢং করে দু'টো বাজলো।

দীনবন্ধু বললে, রাত দু'টো বাজলো। খুব হয়েছে, নে এবার ঘুমো।

বীণা চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করলে।

দীনবন্ধু বললে, ছ্যাখ, মিসেস্ সারখেল্ একটা কথা আমাকে বললে—আমি শুধু সেই কথাটাই ভাবছি।

বীণা জিজ্ঞাসা করলে, কি কথা গো?

দীনবন্ধু বললে, এখানে নাকি খুব চোরের উপদ্রব হয়েছে। সেদিন দিনের বেলা একটা মেয়ের গলা থেকে সোনার হার ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—চোরকে বীণার ভারি ভয়। বীণা বললে, আমার হাতে তো এই চার গাছা আর চার গাছা আট গাছা চুড়ি আছে। কানের দুল দুটো তো সোনা নয়। এই মেলা থেকে কিনেছিলাম—চোদ্দ আনা দাম। তা হাত থেকে চোরে কি আর চুড়ি খুলে নিতে পারবে? তা বোধহয় পারবে না। খুলতে-খুলতে আমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করে ফেলবো।

দীনবন্ধু ম্লান একটু হেসে বললে, চোরদের বুদ্ধি তোর চেয়ে অনেক বেশি। আগেই কাপড় চাপা দিয়ে মুখ বন্ধ করবে। একজন মুখ বন্ধ করবে আর একজন চুড়ি খুলবে।

—ওরে বাবা তাই নাকি?

—হ্যাঁ, এ তো পাড়াগাঁয়ের বোকা চোর নয়, এ বাবা কলকাতার চোর।

বীণা ভাবনায় পড়লো। বলল, তাহলে এগুলো তুমি রাখো ভাল করে। তোমার কাছ থেকে নিতে পারবে না কিছুতেই।

এই বলে চুড়িগুলো হাত থেকে খুলে দীনবন্ধুর হাতে দিয়ে বললে, নাও রাখো ভাল করে।

এইটিই চেয়েছিল দীনবন্ধু।

চুড়িগুলি সে তার কাপড়ের খুঁটে ভাল করে বেঁধে কোমরের কাছে গুঁজে রাখতে রাখতে বললে, এবার আর চোরের বাপেরও সাধ্যি নেই। নে এবার নিশ্চিন্তি হয়ে ঘুমো।

রাত-জাগা ঘুম—ভাঙতে দেরি হলো পরের দিন সকালে।

বীণার ঘুম যখন ভাঙলো, পুবদিকের জানলার পথে তখন খানিকটা রোদ এসে পড়েছে তার বিছানায়। দেখলে, দীনবন্ধু উঠে গেছে। দোরটা খোলা।

বীণা ধড়মড় করে উঠে বস্‌লো। কাপড়-চোপড় সাম্‌লে পরিপাটি করে বিছানা তুলে ঘরের বাইরে এসে দেখলে—না, খুব বেশি বেলা হয়নি। অন্নপূর্ণা জল ঢেলে বোধকরি রান্নাঘরের বাসিপাট্‌ সারছে। ঝাঁটার শব্দ উঠছে।

চান করবার ঘরটা সে দেখেছিল কাল রাত্রে। দিনের বেলা সবকিছু নতুন-নতুন মনে হতে লাগলো। নতুন বাড়ী। পালিশ করা টালির মেঝে। চারিদিক ঝক্‌-ঝক্‌ তক্‌-তক্‌ করছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বীণা যে এরকম বাড়ীতে এসে কোনোদিন থাকতে পাবে তা সে ভাবতেও পারেনি।

কিন্তু রাত্রের দেখা কল-ঘরটা ঠিক ঠাহর করতে পারছিল না কোন্‌ দিকে। বীণা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, পেছন থেকে মিসেস্‌ সারখেলের গলার আওয়াজে চম্‌কে উঠলো।

—চুলে শ্যাম্পু দিয়ে একেবারে চানটা সেরেই এসো।

কিন্তু শ্যাম্পু কাকে বলে সে জানে না। মিসেস্‌ সারখেলের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো বীণা।

সারখেল জিজ্ঞাসা করলেন, কি হলো? দাঁড়িয়ে রইলে যে?

বীণা বললে, ওই যে কি বললে তুমি।

মিসেস্‌ সারখেল হাসলেন। শ্যাম্পু কাকে বলে জানে না মেয়েটা। মস্ত বড় বড় একপিঠ কালো চুলে রাজ্যের ময়লা বসেছে। বিশ্রী নারকেল তেলের গন্ধ। অযত্নে অবহেলায় কেমন যেন আগোছালো হয়ে রয়েছে।

মেয়েটাকে কাল রাত্রে দেখেছেন সারখেল। দিনের আলোয়

ভাল করে দেখলেন। গায়ের রং একেবারে যেন দুধে-আলতায় গোলা। ঢলঢলে কচি মুখখানি যেমন মসৃন, তেমনি নিটোল। দাঁতের সারি, মুখের হাসি, চোখের তারা—সবই যেন দুদণ্ড চেয়ে দেখবার মত। ভাল করে সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখতে পারলে অতি বড় রূপবতীকেও হার মানায়।

মিসেস্ সারখেল নিজেই এগিয়ে গেলেন।

—আয়। তোকে নিয়ে আমাকে দিনকতক খাটতে হবে দেখছি।

বীণাকে নিয়ে কলঘরে ঢুকে ছিট্‌কিনি বন্ধ করে আলো জ্বালিয়ে দিলেন।

ঘরখানা একেবারে ঝল্‌মল্ করে উঠলো।

মনের মত করে এই বাথ্‌রুমটা তিনি দাঁড়িয়ে থেকে তৈরি করিয়েছেন। মেঝের ওপর ফুলকাটা পালিশ-করা টালি বসানো। দেয়াল পর্যন্ত মসৃণ মোজাকের চাকচিক্য। চারিদিকে বড় বড় আশী। বাথ-টাব, বেসিন, স্নান করবার ফোয়ারা—কিছুরই অভাব নেই। দেয়ালের গায়ে র‍্যাকের ওপর দামী দামী তেল, সাবান, শ্যাম্পু, লোশন, স্নো-ক্রিম-পাউডারের ছড়াছড়ি।

আর্শীর সুমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বীণা নিজেই নিজেকে দেখছিল সারখেল বললে, তোকে আজ নতুন মেয়ে করে দেবো ছাখ্। নে খোল্।

বলেই খপ্ করে তার শাড়ী ধরে টেনে কাপড়টাকে বুক থেকে নামিয়ে দিলেন। লজ্জায় দুপা পিছিয়ে গিয়ে বীণা আবার কাপড়টাকে তুলতে যাচ্ছিল, সারখেল বললেন, খুলে ফ্যাল। লজ্জা কিসের? ভাল করে সারা গায়ে অলিভ অয়েল্ মাখিয়ে দিই তারপর সাবান নিয়ে বাথ-টাবে বসে পড়। চুলে শ্যাম্পু ঘষে দিচ্ছি ছাখ্ না, শরীরটা হাল্‌কা মনে হবে।

অনেক কষ্টে অনেক বলে বীণার কাপড় জামা খুলে দিলেন মিসেস্

সারখেল। তারপর তেল মাখিয়ে সাবান মাখিয়ে চুলে শ্যাম্পু দিয়ে সত্যি সত্যিই বীণাকে এক নতুন মেয়ে করে তুললেন তিনি।

নতুন শাড়ী জামা পরে বীণা যখন বেরিয়ে এলো বাথ-রুম থেকে বীণা নিজেই তখন নিজেকে দেখে অবাক। ভুর ভুর করে গায়ে খোস্‌বয় উঠছে। শরীর মন সত্যি সত্যিই হাল্‌কা মনে হচ্ছে।

সারখেল তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। অন্নপূর্ণাকে বললেন, আমাদের তুজনের ব্রেক্‌ফাষ্ট দিয়ে যা।—চা না কফি—কি খাবি বল্‌।

বীণা চা খায় না। কফির নামও জানে না।

বীণা তার ডাগর ডাগর চোখতুটি তুলে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে সারখেলের দিকে তাকিয়ে রইলো।

--কি খাবি বল্‌।

বীণা বললে, যা দেবে তাই খাব। এ সময় কেউ কি আমাকে খেতে দিতো নাকি? উনোন ধরিয়ে কোমরে কাপড় বেঁধে এতক্ষণ আমাকে রান্নাঘরে ঢুকতে হতো। তারপর রান্নাবান্না সেরে সবাইকে খাইয়ে এঁটো কাঁটা পরিষ্কার করে নিজে চারটি ভাত খেতাম। মাছ খাবার জো ছিল না। বিধবা তো।

বলেই ফিক্‌ করে হেসে বললে, আমি কিন্তু দিদি—মিছে কথা কেন বলবো—লুকিয়ে লুকিয়ে মাছ মাংস সবই খেতাম। কেউ আসছে দেখলে ভাতের তলায় চাপা দিয়ে দিতাম।

—বেশ করতিস্‌। কেন খাবি না? মাছ খাবি, মাংস খাবি—সব খাবি! আমি তোকে সব খাওয়াবো।

কথা বলতে বলতে সারখেলের নজর পড়লো বীণার হাতের দিকে।

—কাল রাত্তিরে তোর হাতে সোনার চুড়ি দেখছিলাম না?

—হ্যাঁ দিদিমণি, দেখেছিলে। ছিল যে চারগাছা করে আটগাছা সোনার চুড়ি।

সারখেল জিজ্ঞাসা করলেন, সে চুড়িগুলো খুললি কেন? কোথায় রেখেছিস?

বীণা বললে, আছে সে খুব ভাল জায়গায়। তোমাদের এখানে যা চোরের ভয়। শুনলুম নাকি গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আমি তাই খুলে ফেললুম। হাতে রাখতে সাহস হলো না। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে যদি—

কথাটা তাকে শেষ করতে দিলেন না মিসেস্ সারখেল। বললেন, কে তোকে বললে এ-সব কথা?

বীণা বললে, দীনুদা বললে।

—তারপর?

—তারপর দীনুদা বললে, দে তবে খুলে দে চুড়িগুলো, আমার কাছে রেখে দিই।

—তুই খুলে দিলি?

—দিলুম। বেশ ভাল করে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে কোমরে জড়িয়ে রেখে দিলে। দীনুদার ওই রকম চেহারা হলে কি হবে, গায়ে খুব জোর আছে। কেউ নিতে পারবে না ওর কাছ থেকে। আর তাছাড়া পুরুষ ব্যাটাছেলের কাছে চুড়ি আছে—চোরেরা জানবেই বা কেমন করে?

সারখেলের বুঝতে কিছু বাকি রইলো না। বললেন, যাঃ, 'ওরে রতনমণি রে' হয়ে গেছে।

বীণা বললে, না না রতনমণি নয় গো, দীনবন্ধু। আমার দীনুদা।

সারখেল ম্লান একটু হেসে গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'রতনমণি' তুই বুঝবিনে। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত পড়া থাকলে বুঝতে পারতিস—তোর মত একটা বর্মী মেয়ের যথাসর্বস্ব নিয়ে জাহাজে চড়েছিল যে-ছোঁড়াটা, যাবার সময় সে চোখে রুমাল চাপা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল—ওরে আমার রতনমণি রে, তোকে কলা দেখিয়ে চললাম রে— !

বীণা বললে, আমি বুঝতে পারছি না দিদি।

--বুঝে কাজ নেই। তোর ও চুড়ি আটগাছা গেছে।

বীণা বললে, হেই মা, যাবে কি বলছো দিদিমণি? দীনুদা সে রকম মানুষ নয়। কোথায় দীনুদা, ছাখো না আমি এক্ষুনি নিয়ে এসে তোমাকে দেখাচ্ছি। তোমার কাছে রেখে দেবো।

সারখেল বললেন, সে আর এসেছিস তুই। তোর দীনুদা এতক্ষণ সাগরপারে। সে বাড়ি চলে গেছে।

বীণা বললে, না না দিদি, আমাকে না জানিয়ে বাড়ি তো সে যাবে না। তার সংগে আমার—

কথাটা শেষ হলো না। অন্নপূর্ণা খাবার নিয়ে এলো।

খাবার খাবে কি, বীণার মাথায় তখন বজ্রাঘাত হয়ে গেছে। দীনুদা তাকে বিয়ে করে কলকাতা শহরে সংসার পাতাবে—এই ছিল কথা।

কিন্তু দিদিমণি এখন যা বলছে সে তো সব্বনেশে কথা। দীনুদা তার সোনার আটগাছা চুড়ি নিয়ে তাকে এইখানে ফেলে রেখে লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়েছে।

—খা ভাল করে। কি ভাবছিস?

বীণা বললে, তুমি সত্যি বলছো দিদিমণি? দীনুদা—

সারখেল বললেন, হ্যাঁ-রে-হ্যাঁ, সত্যি বলছি।

সারা জীবনের তার একমাত্র সম্বল আটগাছা সোনার চুড়ি—

সারখেল তার কানের টাপ্ দু'টি হাত দিয়ে দেখলেন।

—এ দু'টো সোনার তো?

বীণা বললে, না দিদি, ও আমি মেলায় কিনেছিলাম, চোদ্দ আনা দাম। সোনা কেন হবে?

বলেই জিজ্ঞাসা করলে, দীনুদা কবে আসবে?

সারখেল বললেন, দীনুদা দীনুদা করছিস কেন? সে যদি না-ই আসে, তুই তো জলে পড়ে নেই। ভালই তো আছিস।

—কিন্তু আমার চুড়ি—

—যাক্‌গে। ও রকম কত চুড়ি তোর আমি গড়িয়ে দেবো ছ্যাখ না!

বীণা একটুখানি শান্ত হলো! বললে, দেবে?

—নিশ্চয়ই দেবো। আজই দিচ্ছি। আমার আটগাছা চুড়ি তোকে আমি বিকেলে পরিয়ে দেবো।

সত্যিই দিলে।

শুধু আটগাছা চুড়িই নয়, গলায় সোনার হার, কানে পাথরের দুল, হাতে পাথর-বসানো আংটি পরিয়ে, ভাল করে সাজিয়ে বীণাকে বললে, এইবার ছ্যাখ গিয়ে ওই আর্শীর সুমুখে দাঁড়িয়ে। ছ্যাখ কেমন মানিয়েছে।

তা সত্যিই মানিয়েছে চমৎকার!

আর নিজেকে ভাল করে সাজতে কোন্ মেয়ে না চায়!

এই একটি দিনেই বীণার রূপ যেন ফেটে বেরিয়েছে।

সন্ধ্যায় একটি ফিতে হাতে নিয়ে একজন দর্জি এলো। মিসেস্ সারখেল তাকে টেলিফোন করে বলে দিয়েছিলেন আসতে।

বীণার গায়ের মাপ নিলে। বডি, ব্লাউস্, আর সায়া চাই। প্রত্যেকটি পাঁচ জোড়া করে। কোন্‌টি কি রঙের হবে সবই বলে দিলেন মিসেস্ সারখেল।

দর্জি চলে গেলে বীণা জিজ্ঞাসা করলে, এত এত জামা কি হবে দিদিমণি?

—পরবি, আবার কি হবে!

—এই এ-ত?

—হ্যাঁ। তার কম ভদ্রভাবে থাকা যায় না।

ভদ্রভাবে থাকার এখনই হয়েছে কি!

ট্র্যাক্সি করে বীণাকে নিয়ে মিসেস্ সারখেল গেলেন নিউ মার্কেটে। সেখান থেকে কিনলেন দামী দামী শাড়ী, জুতো আর প্রসাধন সামগ্রী।

বীণা একেবারে যেন অন্য বীণা হয়ে গেল।

মিসেস সারখেলকে খুব ভাল লাগলো তার। সারখেলের মতন মেয়ে সে জীবনে দেখেনি কোনোদিন।

সারখেল বললেন, আমার কথা শুনবি তো?

বীণা জিব কেটে বললে, হেই মা, এ কী কথা বলছো দিদিমণি, তোমার কথা শুনবো না কি বলছো? তুমি যখন যা বলবে আমি তাই করবো।

সারখেল তারপর থেকে বীণাকে সব সময়েই নিজের কাছে রাখতে লাগলেন। সব সময়েই কত রকমের কত উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন।

—তোদের মত পাড়াগাঁয়ের মেয়েগুলো কত কষ্ট পায় দেখছিস তো?

—তা আবার দেখিনি? দিনরাত ঘর-সংসারের কাজ করে করে গতর নষ্ট করে, তারপর এক কাঁড়ি ছেলে-মেয়ের হেপাজৎ পোয়াতেই জীবনটা কাবার হয়ে যায়।

মিসেস্ সারখেল বললেন, তোকে আর তা করতে হবে না বীণা। আমি তোকে ছ্যাখ্ না কি করি।

সেই দেখবার প্রতিক্ষা করতে লাগলো বীণা।

প্রতীক্ষা তাকে অবশ্য বেশিদিন করতে হলো না।

বীণা তখন জীবন ও যৌবনের রহস্য সবই জেনে ফেলেছে মিসেস্ সারখেলের কাছ থেকে। জেনেছে—মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। তার যৌবনের পরিধি আরও ছোট। এই ছোট পরিধির ভেতরই তাকে আনন্দ আহরণ করতে হবে। এই যৌবনই হলো গিয়ে জীবনের

বসন্তকাল। এইটিকে যারা উপভোগ না করতে পারে তারা নিতান্ত হতভাগ্য।

বীণা প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা দেখে মিসেস্ সারখেলের বাড়ির সব ঘরগুলিই আনন্দ কলরবে মুখর হয়ে ওঠে। বাইরে থেকে নানাবয়সী পুরুষের দল আসে। যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ—সবরকম বয়সের মানুষের ভিড় জমে। রাস্তার ওপর নানারকমের মোটর এসে দাঁড়ায়।

মেয়েও আসে অনেকগুলি। মেয়েরা কিন্তু সবাই যুবতী। সবাই সারখেলের চেনা।

—কি রে সোনালী, অনেকদিন পরে দেখছি। এতদিন আসিসনি কেন ?

সোনালী কলেজে-পড়া মেয়ে। বয়স কুড়ি-বাইশের বেশি নয়। দেখতে বেশ সুন্দরী। হাতের বইখাতাগুলো নামিয়ে রেখে বলে—দাদাটা যা পেছনে লেগেছে দিদিমণি, কোচিং ক্লাসে যাচ্ছি বললে বলে কোথায় তোর কোচিং ক্লাস দেখে আসি চল্। কি কষ্টে যে লুকিয়ে লুকিয়ে আসতে হয়েছে দিদিমণি !

সারখেল বললেন, ছট্‌ফট্ করিসনে। বোস্ একটুখানি। শ্যামসুন্দর তোর জন্যে পাগল হয়ে গেল।

টেলিফোন ধরলেন সারখেল

শ্যামসুন্দরও টেলিফোন ধরলে। কি বললে সারখেলই শুনলেন। তবে অনেকক্ষণ ধরে মনে হলো যেন দুজনের কথা কাটাকাটি চলছে।

সারখেল বললেন, তোমার তো টাকার অভাব নেই শ্যামসুন্দর। তুমি এরকম করছো কেন ? সেদিন দূরে থেকে সোনালীকে দেখেই তুমি পাগল হয়ে তিনদিন এসেছ। হাজার টাকা দেবে বলে আজ আবার আটশ' বলছো কেন ? আমার হাজার, আর সোনালী দুশ'র কম তোমার সঙ্গে কথাই বলবে না।

টাকার অঙ্ক শুনে শ্যামসুন্দর বোধকরি এমন একটা কিছু মন্তব্য

করেছিল যা শুনে টেলিফোনের এপার থেকে মিসেস্ সারখেল বলে উঠলেন, যাক তাহলে আর সোনালীর দিকে হাত বাড়িয়ো না। কলকাতা শহরে নোংরা যে-সব মার্কা-মারা জায়গা আছে—সেইখানে যাও। এখানে আর এসো না।

শ্যামসুন্দর বোধ হয় বলেছিল, হাজার বারোশ' টাকা খরচ করলে অমুক মহারাণীকে পাওয়া যায়।

এদিক থেকে সারখেল বললেন, তাহ'লে সেই মহারাণীর কাছেই যাও।

এই বলে ঝপ্ করে হাত থেকে রিসিভারটা নামিয়ে দিলেন মিসেস্ সারখেল।

সোনালী পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সারখেল বললেন, তোর কপাল খারাপ সোনালী। মেয়েক্যাংলা এই লোকটা লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক একে যদি একবার গেঁথে দিতে পারতাম তোর সঙ্গে। তুই দুশ' টাকা পেয়ে যেতে পারতিস।

সোনালী বললে, উঃ, আজ যদি একশটা টাকা পেতাম দিদিমণি, তিনটে বোনের পরবার শাড়ী নেই, ভাই দুটোর ইস্কুলের মাইনে দেওয়া হয়নি, বাবার ওষুধ পর্যন্ত কেনা হয়নি। যাক্‌গে যা হবার তাই হবে। তুমি তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করে দাও দিদিমণি।

এমন সময় একটি ছেলে এলো—বছর-পঁচিশেক বয়েস। প্রিয়দর্শন সুন্দর চেহারা। কিন্তু—

সারখেল জিজ্ঞাসা করলেন, পকেটে কত আছে দেবু?

ছেলেটির নাম বোধহয় দেবু। বললে, বেশি নেই দিদিমণি। গোটা-তিরিশেক হবে।

ধেৎ! তিরিশ টাকা আবার টাকা নাকি? আজ তুমি তাহলে বাড়ী যাও।

বাড়ী কিন্তু সে কিছুতেই যাবে না। একটা চেয়ারে বসে পড়লো।

বসে বসে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাতে লাগলো সোনালীর দিকে। সারখেল বললেন, উহুঁ উহুঁ, ওদিকে তাকিয়ো না। বাড়ী যদি না যাবে—তো অন্নপূর্ণার ঘরে গিয়ে বোসো।

দেবু এখানকার পুরনো মক্কেল। সবাইকে চেনে। বললে, তোমার সেই ঝি—অন্নপূর্ণা ?

—হ্যাঁ।

তাই তাই সই। দেবু তার পকেট থেকে টাকা তিরিশটি বের করে মিসেস্ সারখেলের হাতে দিয়ে বললে তাই বলে দাও ওকে।

দেবুকে অন্নপূর্ণার কাছে বসিয়ে দিয়ে সারখেল ফিরে এসে দেখলেন—ঘরে বসে আছে একজন অবাঙ্গালী প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

সারখেল আসতেই সে 'নমস্তে' বলে উঠে দাঁড়ালো। কেয়া, দিদিমণি, নয়া মাল কুছ হ্যায় ?

পুরনো মক্কেল বিঠলভাই। মুর্গীহাটায় মস্ত কারবার। মিসেস্ সারখেলের 'নার্সিং হোমে' আসেন তিনি মাসে একবার, কি দু'বার। এবং সব সময়েই চান নতুন কিছু। তার জন্যে খরচ করতে পিছুপা নয়।

খরচের বহরটা কিন্তু মিসেস্ সারখেলের জানা। নতুন হলেই সারখেলের প্রণামী পঁচিশ'। আর মেয়েটির পঞ্চাশ। তার বেশি একটি পয়সাও বিঠলভাই খরচ করতে রাজী নয়। ভদ্রলোক মদ খায় না, পান না, সিগ্রেট না, শুধু একটি সন্ধ্যাসঙ্গিনী পেলেই খুশী।

বীণা আসা-যাওয়া করছিল। বিঠলভাই দেখলে বীণাকে।

বীণাকেও দেখলে। সোনালীকেও দেখলে।

কিন্তু দু'জনেরই দাম অনেক বেশি।

সারখেল বললেন, তোমার ও-টাকায় হবে না বিঠলভাই।

বিঠলভাই বললে, আমার এষ্টিমেট কিন্তু পাঁচের বেশি উঠবে না সারখেল। আমার ফুর্তি করবার জন্যে ওর বেশি একটি পয়সাও আমার কোম্পানী আমাকে দেবে না।

সারখেল বললেন, তুমি খুব কৃপণ বিঠলভাই।

বলেই তিনি হাসতে লাগলেন।

তাঁর হাসি তখনও থামেনি, এমন সময় ঝড়ের মত ঘরে ঢুকলো শ্যামসুন্দর।

—খুব মেয়ে বাবা। সেই যে এক কথা ধরে রেখেছ তার কি আর নড়চড় হবে না?

—না।

সামনেই বসেছিল সোনালী।

শ্যামসুন্দর সেদিকে একবার তাকিয়েই আর কোন কথা বললে না। পকেট থেকে নোটগুলো বের করে মিসেস্ সারখেলের হাতের কাছে ফেলে দিয়ে বললে, নাও। যা বলেছ তাই দিলাম। গুণে ছ্যাখো।

গুণে দেখলেন সারখেল। বারোশ' টাকাই আছে।

তাই থেকে দুশ টাকার নোট সোনালীর হাতে দিয়ে বললেন, এই ছ্যাখো শ্যামসুন্দর তোমার সামনেই আমি ওকে দুশ' টাকা দিয়েদিলাম। আমার যা কথা তাই কাজ।

শ্যামসুন্দর বললে, জানি! জানি বলেই টাকাটা সঙ্গে নিয়েই ছুটে এসেছি।

সোনালীকে তুলে নিয়ে গিয়ে সারখেল তার সবচেয়ে ভাল ঘরখানা খুলে দিলেন। তারপর শ্যামসুন্দরকে বললেন, সোনালীর মতন এমন মেয়ে তুমি কোথাও পাবে না শ্যামসুন্দর। এই ওর প্রথম, আর এই ওর শেষ। খুশী যদি ওকে করতে পারো তো জেনে রেখো সারাজীবনের জন্যে ও তোমার কাছেই রয়ে গেল।

ওদিকে বিঠলভাই বসে আছে। তার টাকাটাও হাতছাড়া করতে ইচ্ছে হলো না সারখেলের। এসেই বললেন, দেখলে তো? বারো শ' টাকা দিয়ে গেল। আর তুমি টাকার কুমীর হয়ে পঁচিশ' টাকার বেশি খরচ করতে রাজী নও। সোনালীর মতন মেয়ে পাওয়া ভাগ্যের কথা।

বিঠলভাই বললে, ওই সোনালী তো ?

সারখেল বললেন, হ্যাঁ, ওই সোনালী। কলেজে পড়ে। খুব গরীব, তাই এ-পথে পা বাড়িয়েছে। নইলে সহজে কি কেউ এ-রাস্তায় আসতে চায় ?

বিঠলভাই বললে, ও তো খোকী আছে।

সারখেল হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, খুকিদেরই তো দাম বেশি। সবাই তো খুকিই চায়।

বিঠলভাই বললে, আমি চাই না।

—তাহ'লে দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোমাকে। অনেক টাকা খরচ করে একটি মেয়েকে আমি আনিয়েছি গ্রাম থেকে। দেখবে ?

বলে তিনি ডাকলেন, বীণা !

ডাকবামাত্র বীণা এসে দাঁড়ালো।

বীণাকে দেখেই বিঠলভাই-এর চোখদুটো কেমন যেন হয়ে গেল। বললে, ঠিক। ঠিক আছে। একেই দাও।

সারখেল মাথা নাড়লেন। এর দাম আরও বেশি।

কিন্তু বীণার সামনে টাকাকড়ির কথা সারখেল বলতে চান না। বীণাকে সরিয়ে দিয়ে সারখেল অনেক চেষ্টা করলেন টাকার অঙ্কটা বাড়াবার। অনেক রকম করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক কথাই বললেন। কিন্তু বিঠলভাই পাকা ব্যবসাদার। একটি পয়সাও বাড়াতে রাজী হলেন না।

সারখেল তখন হাত পেতে বসলেন। বললেন, দাও !

পাঁচশো—পাঁচশোই সই ! এটাই-বা ছাড়েন কেন ?

বললেন, অনেকদিন পরে এসেছ। শুকনো মুখে ফেরাবো না।

বিঠলভাই পঁচিশ' টাকা মিসেস সারখেলের হাতে দিয়ে বললে, মেয়েটির টাকা কি তোমার হাতেই দেবো ?

—আমার হাতে কেন দেবে? যার টাকা তার হাতে দেবে। আমি কারও একটি পয়সা মারতে চাই না। সে রকম মেয়ে আমি নই।

বিঠলভাইকে দেখে বীণা মুখ টিপে-টিপে হাসে আর আড়চোখে মিট্-মিট করে তাকায়।

—ও মা। এ যে বুড়ো!

বিঠলভাই বললে, কি বলছো? আমি বুড্ঢা?

—বুড্ঢা নয় তো কী?

বিঠলভাই বুঝাবার চেষ্টা করতে লাগলো বীণাকে।—বুড্ঢাই তো ভালো। তোমার দেহের ওপর বেশি অত্যিয়াচার করবে না। তুমি সুখে থাকবে। আনন্দে থাকবে।

অত সব সুখ আনন্দ বোঝে না বীণা।

প্রথমে ভাল করে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে বিঠলভাইকে। তারপর বলে, তুমি তো আমাকে বিয়ে করবে না?

—বিয়া? সাদি? আরে, আমার কি সাদি করবার বয়েস?

বীণা বলে, তাই তো বলছি। তোমাকে নিয়ে আমি কি করবো?

সত্যি তো! বীণা এখানে চিরদিনের জন্যে থাকতে আসেনি। এসেছে—বিয়ে-থা করে অন্য কোথাও গিয়ে একটি সুখের সংসার পাতবার জন্যে।

কিন্তু প্রথম দিনেই বিঠলভাই-এর সংগে তার পরিচয়—তার মাথাটাকে কেমন যেন গোলমাল করে দিলে।

শেষ পর্যন্ত একটি কথাও সে বলতে পারলে না।

বলতে পারলে না দু'টো কারণে।

প্রথম কারণ—বিঠলভাই বুড়ো হলে কি হবে, মানুষটি ভাল।

বীণার সংগে কত মজার-মজার গল্প করলে, কত ভাল-ভাল কথা বললে। নিজেও হাসলে। বীণাকেও হাসালে।

তারপর তেমনি হাসতে-হাসতেই প্রায় ঘণ্টা দুই পরে বীণা বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

তেমনি হাসতে-হাসতেই মিসেস্ সারখেলকে বললে, ওকে নিয়ে আমি কি করবো দিদিমণি?

—কাকে নিয়ে?

—ওই যে—যাকে তোমরা বিঠলেভাই নাকি বলছিলে।

মিসেস্ সারখেল বললেন, বিট্‌লেভাই নয় রে—বিঠলভাই।

বীণা বললে, তা যে ভাই-ই হোক্ দিদিমণি। ও বুড়ো তো! ওকে আমি বিয়ে করবো কেন? তাছাড়া ও যেন কেমন-কেমন বেঁকিয়ে-বেঁকিয়ে কথা বলছিল।

—ও তো বাঙালী নয়। গুজরাটি। মস্ত বড়লোক।

—না দিদিমণি, ওর কাছে আমি আর যাব না। আমার খুব হাসি পাচ্ছিল।

মিসেস্ সারখেল বললেন, তা বেশ। তোকে আবার অন্য লোক দেবো।

অন্য লোকের অভাব নেই মিসেস্ সারখেলের নার্সিং হোমে।

রোজ-রোজ নূতন নূতন লোক আসে, আর মিসেস সারখেল তারই কাছে পাঠিয়ে দেন বীণাকে।

বীণার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

টাকা বীণা চায়নি। টাকা রোজগার করবার জন্য এখানে সে আসেনি। এসেছে মনে একটুখানি শান্তি পাবার জন্য। এসেছে স্বামী সন্তান নিয়ে একটি সংসার পাতবার আশায়।

কিন্তু এখানে—মিসেস্ সারখেল যতই কেন বলুন না, বীণার মত বোকা মেয়েও বুঝতে পারলে—সে আশা খুব কম।

পাঁচ-পাঁচটা নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বীণার। বীণা তার মনের কথা তাদের বলেছে। তারা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে তাকে। টাকা দিয়েছে। কাজ উদ্ধার করে চলে গেছে।

বীণা আর পারছে না।

একদিন সে অন্নপূর্ণাকে বললে, চল্ আমরা এখান থেকে পালাই।

অন্নপূর্ণারও তাই ইচ্ছা। হয়ত-বা সে ভেবেছিল—বীণা মেয়েটা বোকা-সোকা মেয়ে। তাকে মূলধন করে বাইরে গিয়ে সে হয়ত ভালই রোজগার করতে পারবে। এখানে মাত্র প্রথম দিন যে-টাকা সে রোজগার করেছিল সেই টাকাটিই আছে তার নিজের কাছে। তারপর সব-কিছু গেছে মিসেস্ সারখেলের খপ্পরে।

বীণা কিন্তু অন্য ধরণের মেয়ে।

রোজ বিকেলে মিসেস্ সারখেল তাঁর স্নানের ঘরে ঢোকেন। এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টার আগে কোনদিন বেরোন না সেখান থেকে। সেইটেই উপযুক্ত সময়।

মিসেস্ সারখেল তাকে যে-সব গয়না কাপড় দিয়েছিল সেগুলি এক জায়গায় বেঁধে সারখেলের ঘরে রেখে দিয়ে এলো। তারপর অন্নপূর্ণাকে বললে, চল।

দু'জনে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়।

কোথায় যাবে তার কোন স্থিরতা নেই।

অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি পথ হাঁটছিল। বীণা একেবারে আনাড়ি। কলকাতা শহর জীবনে সে এই প্রথম দেখলে। কলকাতা দূরের কথা, কোন শহর-ই সে দেখেনি কোনদিন। আশে-পাশের দোকান-দানি লোকজন দেখে তার মাথাটা ঘুরছিল। সেইসব দেখতে-দেখতে পথ চলছিল সে।

অন্নপূর্ণা যত বলে, ওদিকে কি দেখছো ?

বীণা তত বলে, দাঁড়াও। দেখি।

গাড়ি-ঘোড়া বাঁচিয়ে পথ চলতে না জানলে যা হয়, শেষ পর্যন্ত অন্নপূর্ণা যা ভয় করেছিল তাই হলো।

চোখের সম্মুখে একটা চলন্ত মোটর-কারকে বাঁচাতে গিয়ে বীণা পড়লো গিয়ে একটা লোকের গায়ে। লোকটা তাকে ঠেলে দিতেই বীণা হুমড়ি খেয়ে পড়লো রাস্তায় ওপর। বীণাকে বাঁচাতে গিয়ে তারই পাশে তখন একটা রিক্সার সংগে আর একটা ট্রাকের লাগলো ধাক্কা।

চারিদিকে হট্টগোল বেধে গেল। এদিক-ওদিক থেকে লোকজন ছুটে এলো।

বীণার কি হলো অন্নপূর্ণা বুঝতে পারলে না। মনে হলো যেন গাড়িটা বীণার গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেছে। হয় তো-বা মরেই গেল।

অন্নপূর্ণার ভয় হলো। এক্ষুনি পুলিশের হাঙ্গামা হবে। তাকেই ধরবে হয়ত—কে তোমরা ? কোথায় যাচ্ছিলে ? কেন যাচ্ছিলে ?

তার চেয়ে—

অন্নপূর্ণার বুকের ভেতরটা তখন থর্‌-থর্‌ করে কাঁপছে। সে ভাবলে চুপি-চুপি সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়াই ভালো।

তাই সে ছুটতে আরম্ভ করলে। ছুটে গিয়ে ঢুকলো একটা গলির ভেতর।

তারপর কোথায় কোন্‌দিকে চলে গেল কেউ বুঝতে পারলে না। তার হাতে কিছু টাকা আছে। যেখানে হোক একটা আশ্রয় সে পাবেই।

বীণা মরেনি।

হাতের হু'জায়গায় কেটে গিয়ে রক্ত গড়াচ্ছিল। সবচেয়ে বেশি চোট লেগেছিল পায়ে। কয়েকজন লোক তাকে ধরাধরি করে একটা ট্যাক্সিতে চড়িয়ে হাসপাতালে দিয়ে এলো।

ইমার্জেন্সী থেকে সার্জিক্যাল্ ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। যন্ত্রণায় তখন সে কাৎরাচ্ছে।

নিজের নামটা সে ঠিকই বলেছিল। তারপর বাকিটা আর বলতে পারেনি। ইচ্ছে করেই বলেনি কিনা তাই-বা কে জানে।

পায়ে একটা ছোট্ট অপারেশন করতে হয়েছে।

বীণার জ্ঞান যখন হলো—দেখলে সে শুয়ে আছে হাসপাতালের বিছানায়। একজন নার্স তার সেবা করছে।

এই নার্সটির সঙ্গে হলো তার পরিচয়।

পরিচয় হলো ঘনিষ্ঠ।

মেয়েটির নাম তনিমা বোস। সুন্দর চেহারা। দেখতে অনেকটা বীণার মতই।

বীণা সেরে উঠেছে। এখন আর তার হাসপাতালে থাকার প্রয়োজন নেই।

সেদিন তনিমা বললে—আর ত তোকে আটকে রাখতে পারবো না বীণা, তুই ত চলে যাবি—

তার কণ্ঠস্বর যেন উচ্ছ্বাসে রুদ্ধ হয়ে আসে।

বীণা নির্বোধের মত তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে।

তনিমা একটু স্থির হয়ে বলে—কোথায় তুই যাবি বীণা?

—আমি?

—হ্যাঁরে। তুই। তোর কথাই বলছি।

একটু থেমে বীণা বললে—গাঁয়েই ফিরে যাব।

—দূর বোকা মেয়ে। এত কেলেঙ্কারীর পর সেখানে গেলে থাকতে পারবি নে।

—তা তো বটে।

তনিমা ভাবতে লাগল, জবাব দিলে না।

বীণা বললে—দীনুদার দেখা পাব না আর, পেলেও তাকে বিয়ে করব না ঠিক। আর একটা লোককে চিনি—দিদিমণির ওখানে আলাপ হয়েছিল। রাসুবাবু তার নাম। বিয়ের কথা বলেছিলাম তাকে। লোকটি ভাল লোক। কিন্তু তার ঠিকানাও তো জানিনে।

তনিমা যেন অকূলে কূল পেলে। বললে—তুই ব্রাহ্ম হতে যদি রাজী থাকিস তবে তোর বিয়ে দিতে পারি।

বীণা বললে—বেরাহ্ম হয়েই ত দীনুদাকে বিয়ে করব কথা ছিল।

—তবে ত ভালই হলো। যাক বাঁচা গেল।

তনিমা নিশ্বাস ফেললে।

তারপর একটু থেমে বললে—চল্ তাহলে আমার বাড়ীতে। সেখানে ভালভাবেই থাকতে পারবি।

বীণার আনন্দের সীমা নেই। যা-হোক একটা নিরাপদ আশ্রয় মিলেছে ভেবে সে গ্রামের মা-মঙ্গলচণ্ডীকে মনে মনে প্রণাম করলে।

যার কেউ নেই, তার ভগবান আছেন।

তনিমার বাড়িতে বীণার আশ্রয় মিলে গেল।

পথের ধারেই ছোটখাটো দোতলা একখানা বাড়ী। বাড়ীতে লোকজন বিশেষ কেউ নেই। নিচের তলার একটা দিক ভাড়া দেওয়া

হয়েছে। সেখানে এক বুড়ী ও তার একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে একখানি ঘর নিয়ে বাস করে।

আর একখানা ঘরে থাকে তনিমার দাদা। তনিমা—আর তার সহোদর এক দাদা।

বীণা বলে—এই জন্যেই ভাই আমাদের এত মিল। তোরও একটি দাদা আর নিজে। আমারও একটি দাদা আর—

বলতেই তার সেই নিজের দাদাটির কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়তেই তার চোখ দুটি উঠলো সজল হয়ে। তার সেই দাদা আজ আর ইহলোকে নেই।

বীণা জিজ্ঞাসা করলে, দাদার তোর বিয়ে হয়নি? বৌ নেই?

তনিমা তাকে সাদরে কাছে টেনে এনে কানে-কানে বললে—হয়েছিল, মরে গেছে।

—ইস্ মারা গেছে!

—তাতে ত ভালই হয়েছে।

—ভাল? কেন?

—আমার এই দাদার সঙ্গেই তোর বিয়ে দেবো। তুই আমাদের বৌ হয়ে থাকবি।

—যাঃ! বলে হাসতে হাসতে বীণা তাকে ঠেলে দিয়ে বললে—তোর দাদা আমারও দাদা হয়। তুই সব জেনে-শুনে···ধেৎ!

বলে লজ্জায় মুখখানা রাঙা করে বীণা পেছন ফিরে দেয়ালের গায়ে একটা আর্শীতে তার মুখ দেখতে লাগলো।

তনিমা শুধু মুখ টিপে হাসলো। কোন উত্তর দিলে না।

তনিমার এই দাদাটির নাম গণপতি।

গণপতিই বটে! দিব্যি গোলগাল দেহখানি। সংসারের কাজ-কর্ম কিছুই করে না। বোনের বাড়ীতে দু'বেলা খায় আর নিচেকার ঘরের জানলাটির কাছে বসে-বসে দিনরাত ভূঁড়ি নাচায়।

গায়ের রং তার কালো। তনিমার মত ফর্সা নয়। চেহারার মিল তাদের কোথাও নেই।

অথচ এক মায়ের পেটের ভাই।

আশ্চর্য! ভাই-বোন বলে চেনাই যেন দায়! শুধু রূপ নয়, ব্যবহারের দিক থেকেও তেমনি!

গণপতি জানলাটির কাছে বসে থাকে। সুমুখের পথ দিয়ে পাড়ার ছেলেরা হেঁটে যায়।

গণপতি— ডাকে ওরে, ও রতনা, শোন ত ভাই!

রতন ঘরে এসে দাঁড়ালে গণপতি আঙ্গুল বাড়িয়ে গড়গড়াটা দেখিয়ে দিয়ে বলে—খা-না, তামাকটা একবার খা-না দাদা!

তামাক খাবার মানে রতন জানে।

ঘরের কোণে বিস্কুটের একটি পুরোনো টিনে তামাক থাকে। পাশে একটি কাগজের বাক্সে থাকে কাঠের কয়লা। কল্‌কেয় তামাক সেজে আগুন ধরিয়ে নিজেই টেনে ধোঁয়া বের করে দিতে হয়।

সেই ধোঁয়া বের করতে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে যদি কেউ টানে ত গণপতি অস্থির হয়ে উঠে। হাত বাড়িয়ে বলে—আঃ! জ্বালাতন করলে দেখছি! তুই নিজেই যদি টেনে-টেনে তামাকটা পুড়িয়ে ছাই করে দিবি ত, আমি আর শেষে খাব কি! ঘোড়ার ডিম?

রতন হয়ত গড়গড়ার নলটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে যেতে চায়। গণপতি বলে—এই, যাস্ কোথায়?

রতনের হাতে বাজারের থলি। হয়ত সে বাজার করতেই বের হয়েছিল এই পথ দিয়ে।

সে বললে—বাজার যাচ্ছিলুম।

—তা ভাল, না-হয় একটু পরে-ই যাস্!

—পরে, কেন?

—তাহলে আমিও যাব তোর সংগে।

বলে তাল-পাতার পাখাটি তার হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে গণপতি বললে—দে-না, পাখার এই বাঁটটি দিয়ে পিঠটা একটু চুল্‌কে দে-না ভাই। উঃ, ঘামাচির জ্বালায় গেলুম!

বাধ্য হয়ে তাই করতে হয় তাকে।

গণপতি তার ময়লা বালিসটি হাতের নিচে টেনে এনে কাৎ হয়ে তামাক টানতে-টানতে দিব্যি আরাম করে চোখ বুজে বলে—মাইরি, তোর মত ছোকরা পাড়ায় আর আমি কাউকে দেখলাম না! হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইখানটা আর-একবার—বেশ জোরে-জোরে, ব্যস, এই ডানদিকে—আহাহা তোর ডানদিকে নয় রে বাপু, আমার ডানদিকে .. হ্যাঁ, ঠিক।

পাখাটা হাত থেকে নামিয়ে দিয়ে রতন বলে—উঠি তাহলে গণুদা, তুমিও যাবে বলছিলে না বাজারে? যাবে তো চল!

গণপতি বলে—না, আমি আর যাব না, তুই-ই যা।

গণপতির ভয়ে পাড়ার ছেলে-ছোকরারা সহজে কেউ আর এই জানলার পাশ দিয়ে হাঁটে না। খুব বেশি প্রয়োজন থাকলেও অন্য গলি দিয়ে ঘুরে যায়।

এইবার পাড়ার ছোট-ছোট মেয়েগুলোকেও ডেকে-ডেকে ফরমাস্ খাটাতে সুরু করেছে গণপতি। কিন্তু একবার যে আসে, দ্বিতীয়বার সে আসতে চায় না।

বিনয়দের বাড়ি থেকে বাজারে যাবার এইটাই সোজা পথ।

গণপতির ঘরে একদিন বিনয়ও এমনি নাস্তানাবুদ হয়ে প্রতিজ্ঞা করলে, সে আর কোনদিন ও-পথ দিয়ে হাঁটবে না।

কিন্তু এমনি ভোলা মন, প্রতিদিনই বিনয় ভুলে যায় আর গণপতির হাঁক শুনে চমক ভাঙে।

গণপতি ডাকে—আরে বিনয় যে—

বিনয়কে বাধ্য হয়ে বলতে হয়—কি ব্যাপার গণুদা—

—তুই তো বাজারেই যাচ্ছিস ভাই, তা আমাকে দু'আনার উচ্ছে আর দু'পয়সার কাঁচালঙ্কা আনতে বলেছে তনি। তা তুই-ই নিয়ে আসিস ভাই। এই নে পয়সা।

বলে একটা সিকি নেয় বিনয়ের হাতে।

বিনয়কে নিতে হয় বাধ্য হয়ে।

গণপতি তখন বলে—যাকগে, পয়সাটা যখন নিলি, তখন দু'আনার কুচো-চিংড়ি আর এক'আনার পটোল নিয়ে আসিস এই সংগে।

নিজের ভোলা-মনের জন্যে বিনয় নিজেকেই ধিক্কার দেয়। রীতিমত একটা বাজারের ফর্দ ঘাড়ে গছিয়ে দিলে! ভাবে, কাল থেকে এ লোকটাকে সে নিশ্চয়ই এড়িয়ে চলবে।

এমনি করে সকলেই প্রায় গণপতিকে এড়িয়ে চলে।

কিন্তু আজকাল আর গণপতির ভাবনা নেই। বিশ্ব-সংসার তাকে যদি আজ অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে রাখে তা হলেও সে নিশ্চিন্ত।

খেতে বসে তনিমার মুখের পানে কৃতজ্ঞতা-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে ঈষৎ হেসে বললে—বীণা মেয়েটি বড় খাসা মেয়ে তনিমা।

তনিমা হাসলে। বললে—তোমার মনে ধরেছে?

গণপতি লজ্জায় মাথা নিচু করে বললে—ধেৎ।

তনিমা বললে—ধেৎ কি রকম? তোমার সংগে যে ওর বিয়ে দেবো!

কথাটা সে-রকম করে গণপতি ভাবেনি। আনন্দে তার কালো মুখখানা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললে—বিয়ে? বিয়ে কেন? বিয়ে যে আমি আর করব না ভেবেছি তনিমা। তা·· ও মেয়েটির বিয়ে কি এখনও হয়নি?

তনিমা বললে, না।

পাশের দরজায় ঠক্-ঠক্ করে শব্দ হতেই তনিমা তাকিয়ে দেখে বীণা কখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

তার মুখ দেখে মনে হয় কথাটার সে প্রতিবাদ করতে চায়।

তনিমা চোখ টিপে মাথা নেড়ে তাকে নিষেধ করলে। তারপর আবার সে গণপতির মুখের পানে তাকিয়ে বললে—কেন, তাতেই বা কি হয়েছে? বিধবা বিবাহও তো হয় আমাদের।

গণপতি ঘাড় নেড়ে বলবে—হ্যাঁ, তা নয়·· তা বেশ, তাহলে সব ঠিকঠাক করেই ফ্যাল্। এত করে বলছিস যখন···

আসল ব্যাপার কিন্তু অন্য ধরণের।

গণপতির বিয়ে হয়েছে, একবার নয়—তু'বার। প্রথম বিয়ে যখন হয়, তখনও তার বিধবা মা বেঁচে ছিলেন। তনিমারও তখন বিয়ে হয়েছে। কিন্তু এমনি তুর্দৈব, একই বছরে গণপতির বৌ মারা গেল—আবার তনিমার ইঞ্জিনীয়ার স্বামীটি কোন্ এক সেতু তৈরী করতে গিয়ে বিদেশেই প্রাণ হারালো।

বৌ গেল, জামাই গেল—সহায়-সম্বলহীনা বিধবা মা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। কলকাতার বাড়ীখানা একমাত্র সম্বল।

মূর্খ গণপতি কানা নয়, খোঁড়া নয়—বিয়ে তার যেদিন ইচ্ছা সেইদিনই হবে—সেজন্যে চিন্তার কিছু নেই। মার ভাবনা শুধু এই মেয়ে তনিমার জন্যে। বিয়ের পর মেয়ে একমাস মাত্র শ্বশুরবাড়ীতে বাস করে এসেছে। নিতান্ত অপরিচিত সেই স্বামীর সংসারে

অনাবশ্যক একটা বোঝার মত বিধবা হয়ে আজীবন বাস করার বিড়ম্বনা যে কি মর্মান্তিক তা তিনি জানেন।

মেয়েকে আর সে-দুর্ভোগ যাতে না পোহাতে হয়, মা সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন।

বাড়ির নিচের তলায়, এখন যে-ঘরে গণপতি বাস করছে, সেই ঘরখানি মাত্র নিজের জন্যে রেখে বাকি সমস্ত ঘরে তিনি ভাড়া বসালেন। পরের মুখাপেক্ষী হয়ে মেয়ে যাতে বিড়ম্বিত না হয়, তাই তিনি তনিমাকে ধাত্রীবিদ্যা শিখবার জন্যে ক্যাম্বেলে ভর্তি করে দিলেন।

কলেজে সে ধাত্রীবিদ্যা ভাল করেই পড়েছে, তার ওপর বুদ্ধিমতী, ধাত্রীবিদ্যা তাই সে ভালই শিখলে। কিন্তু মার দুর্ভাগ্য, মেয়ের সুখ-সুবিধা তিনি নিজের চোখে দেখে যেতে পারলেন না। কলেজ থেকে পাশ করে তনিমা চাকরি পাওয়ার সংগে-সংগেই মা মারা গেলেন।

নিচে মাত্র একঘর ভাড়াটে রেখে, অন্য ভাড়াটেদের উঠিয়ে দিয়ে তনিমার প্রথম চেষ্টা হলো দাদা গণপতির বিয়ে দিয়ে সুন্দরী একটি বৌ ঘরে আনা। তনিমার একজন সঙ্গিনী চাই।

নিতান্ত গরীবের ঘরের সুন্দরী একটি বয়স্কা মেয়েও জুটল। দিন তাদের মন্দ কাটছিল না। তনিমার সংগে নববধূর ভাবও বেশ জমে উঠল। কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে যে কি হলো, হঠাৎ একদিন এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ থেকে ফিরেই তনিমা তার উপরের ঘরে গিয়ে দেখে, তার নতুন বৌদিদিটি কাপড়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

গোলমাল গণ্ড-গোলের আর অন্ত রইলো না। নব-বিবাহিতা

বৌয়ের শোকে তার দাদা ছেলেমানুষের মত গড়া-গড়ি দিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

তনিমার নানা বয়েসের নানা ডাক্তার-বন্ধু এসে জুটলো। নার্স বন্ধু এলো, পুলিশ এলো। খুব খানিকটা হৈ-চৈ গোলমালের পর ঘণ্টাকয়েকের মধ্যেই হাঙ্গামা-হুজ্জুতি সব চুকে গেল।

হাঙ্গামা চুকলো বটে, কিন্তু এরপর কাণা-ঘুষোয় পাড়ার মধ্যে একটা বিশ্রী জনরব উঠলো। সকলেই বলাবলি করতে লাগল যে, তনিমার স্বভাব-চরিত্র তার পাঠ্যাবস্থা থেকেই খারাপ, সেকথা সকলেই জানে। এখন সে স্বাধীন মহিলা, এখন তো আর কথাই নেই।

তনিমার বাড়িতে যে-সব ডাক্তার-বন্ধুদের যাওয়া-আসা চলে তাদেরই মধ্যে একজন নাকি গণপতির নিরপরাধ সুন্দরী বধূটির ওপর অত্যাচার করে। তারই ফলে এই শোচনীয় দুর্ঘটনা। আর শুধু তাই নয়, ব্যাপারটা তনিমা আগাগোড়া সবই জানে। এমনি করে রোজগার করার জন্যেই তার ওই নির্বোধ দাদাটির জন্যে সে বহুদিন থেকেই একটি সুন্দরী মেয়ের সন্ধান করছিল।

সে যাই হোক্, চট্ করে ওসব কথা আমরা বিশ্বাস করি না।

তবে এর পরেও গণপতির আর একটি বিয়ে দেবার চেষ্টা তনিমা যে অনেক করেছে, তা আমরা জানি।

কিন্তু শত্রুপক্ষ বলে, তনিমা সম্বন্ধে জনরবটা নাকি চারিদিকে এতবেশি প্রচারিত হয়ে গেছে যে শুধু সেইজন্যেই মেয়ে সেখানে কেউ দিতে চায় না।

বীণাকে সে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই নাকি এখানে এনেছে।

বেচারী বীণা অত-শত বোঝে না।

খাওয়া শেষ করে গণপতি আঁচিয়ে এলো। তারপর খিলি দুই পান মুখে পুরে, খিলি-দুই হাতে নিয়ে, আপন মনেই নিচে নেমে গেল। মৃদু হাসিতে তার কালো মুখখানি তখন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

চটি জুতোর শব্দ তখনও সিঁড়ির ওপর থেকে মিলিয়ে যায় নি—বীণা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গণপতির উচ্ছিষ্ট থালার কাছ থেকে দই-এর খুরিটা তুলে নিয়ে বেশ করে সেটাকে ধুয়ে ফেলে খানিকটা ভেঙে মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে তনিমার কাছে এসে বললে—দাঁড়া, তোকে আমি দেখাচ্ছি মজা।

ঈষৎ হেসে তনিমা বললে—পরে দেখাস্। এখন তুই সরে দাঁড়া এখান থেকে। তোর ওই মাটির খুরি খাওয়া দেখে আমার সর্বাঙ্গ শির শির করছে।

পোড়া মাটির খুরির খানিকটা ভেঙে তনিমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে—খেয়ে ছাখ্ না!

তনিমা বললে—না, বিকেলে তোকে একটি মাটির কলসী আনিয়ে দেবো, খাস্।

বীণা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

গণপতিকে বিয়ে করতে আপত্তি সে বড় কম করেনি। আপত্তি যে শুধু গণপতির চেহারা খারাপ বা স্বামী হিসেবে সে অযোগ্য তাই নয়; প্রথম আপত্তি সে তার প্রিয় বন্ধু তনিমার সহোদর ভাই। দ্বিতীয় আপত্তি, গণপতি তার জীবনের ইতিহাস সবটুকু না-জেনেই তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে।

কিন্তু তনিমার অনুরোধে তার কোন আপত্তিই টিকলো না।

রাত প্রায় ন'টার সময় তনিমার এক ডাক্তার-বন্ধু মোটরে করে তাকে সেদিন তার দরজায় নামিয়ে দিয়ে গেল।

গাড়ি চালাচ্ছিলো ডাক্তার নিজেই। তনিমা গাড়ি থেকে নেমে হাসতে-হাসতে হাত বাড়িয়ে ডাক্তারের প্রসারিত হাতে হাত মিলিয়ে বললে—গুড্ নাইট্।

গাড়ি নিয়ে ডাক্তার চলে গেল। জুতোর শব্দ করে তনিমা ওপরে উঠে এলো। বীণা তারই আগমন প্রতীক্ষায় জেগে বসেছিল। জিজ্ঞাসা করলে—আজ এত রাত যে?

দামী এসেন্সের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে তনিমা তার কাছে এসে বললে—কেউ এসেছিল আমার খোঁজে?

বীণা বললে—হ্যাঁ, তিনবার তিন-তিনটি ছোকরা এসে ফিরে গেছে।

—কাউকে চিনিস তাদের?

—রাঁধুনী বামুন-ঠাকরুণের সঙ্গে কথা হলো, আমি এই দরজার ফাঁকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। দুজনকে চিনি না, তবে একজন—সেই-যে প্রায়ই আসে, সেই ছোকরাটি, অমর না-কি-যেন নাম—

চিঠিপত্র কিছু রেখে গেছে?

—না, বলে বীণা কাছে সরে এসে বললে—হাঁপাচ্ছিস্ যে? খুলে ফ্যাল না এসব। বলে সে তার জামার বোতাম খুলে দিতে লাগল।

জামা-জুতো খুলে পরিচ্ছন্ন হয়ে এসে তনিমা বললে—এই বীণা, শোন! দাদা খেয়েছে? বামুন-ঠাকরুণ চলে গেছে?

—হ্যাঁ, বাকি শুধু তুমি আর আমি।

ঠিক সেই কথাটিরই যেন প্রতিধ্বনি করে তনিমা একটা গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বললে—শুধু তুমি আর আমি। আমি আর তুমি!

বলেই মুখ তুলে সেই শুভ্র সুন্দর সুচিক্কণ দন্তপংক্তি ঈষৎ বিকশিত করে হেসে তনিমা চোখের ইশারায় তাকে কাছে ডেকে বললে—বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বীণা, আয়-না, শুই দুজনে।

বীণা শোবার জন্যে এগিয়ে আসছিল। তনিমা বললে—আলোটা নিবিয়ে দে, আলো ভাল লাগে না।

ইলেকট্রিকের আলো সুইচ টিপে নিভিয়ে দিয়ে বীণা বিছানায় এসে বসল।

অন্ধকার ঘরের ভেতর তাদের দুজনের সাদা ধবধবে পাশাপাশি দুটি বিছানা। রাস্তার দিকে রেলিং-দেওয়া ছোট বারান্দাটি অতিক্রম করে তিনটে বড় বড় দরজার ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্নার প্রচুর আলো এসে বিছানায় পড়েছে।

বীণাকে তনিমা তার কাছে টেনে আনলে।

রাস্তার ওপারে প্রকাণ্ড একটা লাল-রঙের তেতলা বাড়ীর মাথার ওপরে আকাশে চাঁদ জেগে রয়েছে।

সেদিন বোধ হয় পূর্ণিমা। মৃদুমন্দ বাতাস বয়ে চলেছে। তনিমা বললে—বসে রইলি কেন না? শো।

বলে বীণাকে এক-রকম জোর করে শুইয়ে দিয়ে বাহু-বন্ধনে জড়িয়ে বুকের ওপর চেপে ধরে ডাকলে—বীণা!

কণ্ঠস্বরে সে কি আবেগ।

বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত মিলনের রাত্রে প্রিয়া যেমন করে প্রিয়তমাকে ডাকে—এও যেন ঠিক তেমনি।

বীণা তার একান্ত সন্নিকটে তার সেই দীর্ঘপক্ষ দুটি অচঞ্চল চোখ তনিমার সুন্দর মুখখানির ওপর নিবদ্ধ রেখে নিস্তব্ধ অসাড়ভাবে চুপ করে ছিল।

সহসা তনিমা আবেগ-উন্মত্ত চঞ্চলতায় স্থির থাকতে না পেরে বীণাকে আরও কাছে টেনে এনে সেই রক্তিম দুটি ঠোঁটে সজোরে নিজের দুটি কোমল ওষ্ঠ চেপে ধরতেই বীণার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ঈষৎ হেসে সে নিজের মুখখানা সরিয়ে নিয়ে বললে—ও কি রে! পাগল হলি নাকি?

তনিমার তখন ঘন-ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। বললে—না, তোকে আমার বড্ড ভালো লাগে।

বলেই একটুখানি থেমে সে আবার বললে—পুরুষ হলে তোকে আমি বিয়ে করতাম। বাড়ী ছেড়ে তোর সঙ্গে পালিয়ে যেতাম।

—যাঃ, বলে বীণা চড় মারলে।

—ভাল আমার তোকেও লাগে, তাই বলে ও কি ?

তনিমা বললে, শোন্,—তুই আমার দাদাকে বিয়ে কর।

বীণা হেসে বললে—তুই একটা বিয়ে কর-না ভাই তনিমা। কত ভালো-ভালো ছোকরা আসে তোর কাছে।

—বিয়ে ? বলে তনিমা হাসলো। তারপর একটু থেমে বললে—তোর আগে বিয়ে দিই, তারপর দেখা যাবে।

—না ভাই, বিয়ে যদি করতেই হয়, সব-কথা তোর দাদাকে বলে দেবো আগে !

তনিমা বললে—খবরদার বলছি লক্ষীছাড়া মেয়ে, বলিস্‌নে। বলবি যদি, তাহলে এই শেষ। তোর সঙ্গে আর কথা বলব না।

—তোর দাদাকে কিছু বলবো না ?

—না।

—কিন্তু না বললে যদি শেষে—

—কোন 'কিন্তু' নেই বোকা মেয়ে। পুরুষ মানুষকে মেয়েদের সব কথা বলতে নেই। জীবনে অনেক দুঃখ ত পেয়েছিস্, আরো যদি পেতে চাস্, যা-খুশী করগে যা। কিন্তু আমার কথা শুনলে জীবনে সুখ পাবি।

বীণা ভাবলে, হয়ত বা সত্যি তাই। সে যে নির্বোধ ছেলেবেলা থেকে সে কথা সে শুনে আসছে। তার এই নির্বুদ্ধিতার জন্যেই হয়ত এত কষ্ট। কিন্তু তনিমা শুধু রূপবতী নয়, বুদ্ধিমতী। জীবনের নানান অভিজ্ঞতা তার আছে। বীণা ভাবলে, তনিমার পরামর্শ নেওয়া ভাল। গণপতিকে তার নিজের জীবনের কথা কিছুই সে বলবে না।

গণপতির সঙ্গে বীণার বিয়ে হয়ে গেল।

বিধবা বীণা হলো বধূ। পায়ে আলতা, গায়ে গহনা, পরণে শাড়ি—মানিয়েছে চমৎকার।

গণপতির খুশীর আর সীমা নেই। সিল্কের জামা গায়ে দিয়ে একমুখ পান খেয়ে দাঁতগুলি রাঙা করে, হাসতে-হাসতে উপরে এসে ডাকে—তনি!

বীণা ঘোমটা টেনে সরে দাঁড়ায়। তনিমা বলে—কি?

গণপতি বলে—আমি মুন্সিপালের মার্কেটে গিছ্‌লুম। ফ্লেশের দর কত জানিস্? এক টাকা বারো আনা সের। আজ আমাদের বাড়ীতে কিছু আনলে হতো!

তনিমা হেসে বলে—ফ্লেশ মানে বুঝি মাংস? মাংস আজ আমি আনিয়েছি যে!

—এনেছিস্? তবে আর কি! বলে সেখান থেকে চলে যাবার জন্যে গণপতি একবার পেছন ফিরে আবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়। সহজে সেখান থেকে নড়তে ইচ্ছে করে না। বীণার দিকে ঘন-ঘন তাকায় আর বলে—আচ্ছা তনিমা, আমাদের একদিন থিয়েটার কি বায়িস্কোপে গেলে হয় না?

তনিমা বলে—আমার যাবার সময় কোথায় দাদা? তুমি যাও না তোমার বৌকে নিয়ে।

গণপতি তার পকেটে হাত দিয়ে লম্বা একটা ছাপা বিজ্ঞাপনের কাগজ বের করে বলে—এই ত্যাখ্, মুন্সিপালের বাজারের কাছে সেই যে বায়িস্কোপটা আছে না, সেখানে যেতেই এই কাগজটা পেলাম। খুব ভাল বায়িস্কোপ—টেন কন্‌ডিমেণ্টস্।

তনিমা দেখলে, কাগজের ওপর লেখা আছে—টেন কমাণ্ডমেণ্টস্। হেসে বললে—বেশ ত যেয়ো একদিন, আজও যেতে পার।

—হ্যাঁ ঠিক, আজকে হোয়েদার ভাল আছে, আজই যাওয়া যাক। ওগো শুনছ? এই।

কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণের এত চেষ্টা সত্বেও বীণা সেই যে উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইল, কিছুতেই সে আর ওদিকে মুখ ফেরালে না।

গণপতি বললে—আচ্ছা দ্যাখ ত তনিমা, ও যদি অমনি ধারা করে ত, হাউ আই উইল টেকিং হিম্ গো?

বলেই সে ইংরাজিটা সংশোধন করে নিলে—ও ইয়েস্, আই ফরগেট, হিম্ নয় হার হবে।

তনিমা বললে—দাঁড়াও, লজ্জা ভাঙতে দেরী হবে না? ওরে, ও বীণা, লজ্জা-টজ্জা করিস্ নে ত বাপু, লজ্জা কিসের?

গণপতি এবারে খানিকটা আশ্বস্ত হলো।

বললে—দে-দে, ওকে বুঝিয়ে দে ভাল করে। আমি ততক্ষণ তামাকটা একবার—

বলে সে নিচে যাবার জন্যে সিঁড়িতে পা দিয়েই যেন আপন মনেই বলতে লাগলো—নিজে তামাক-সাজার মত হাঙ্গামা আর কিছু নেই। রাস্তার লোক ডেকে-ডেকে আগে খেতাম, আজকাল আর সেটাও ভাল লাগে না।

বলতে-বলতে সে সত্যিই নিচে নেমে গেল।

তনিমা বীণার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই দেখলে, সেও তখন তার দিকে মুখ ফিরিয়েছে।

তনিমা বললে—অত লজ্জা কেন লা লজ্জাবতী?

বীণা হাসল। সেই চমৎকার হাসি।

বীণা বললে—দেখছিস দাদা আমার কেমন ইংরেজী বলে। কথাটা বলে সে আর নিজেকে সামলাতে না পেরে হেসে ফেললে।

কিন্তু বীণা অতসব বোঝে না।

কাছে এসে বললে—বলবেই ত। তোর চেয়েও বেশি পড়েছিল, নিশ্চয়ই।

তনিমা এইবার প্রাণপণে তার হাসি দমন করে বললে—বেশি পড়েনি, কম পড়েই এত! বেশি পড়লে ত আর রক্ষে ছিল না।

বীণা বললে, ও। দুনিয়ার সবকিছু সম্বন্ধে তার এই সরল বিশ্বাস।

তনিমা বললে—যা-না তামাকটা সেজে দিতে বললে, যা তামাকটা একবার সেজেই দিগে-যা!

বীণা বললে—দিতে আমার ইচ্ছে করে. কিন্তু পাড়ার যত ছেলেরা এসে জানলায় উঠে এমন করে উঁকি মারে তনিমা, আমার ভারি লজ্জা করে ভাই।

তনিমা বললে—যা। জানলাটা না-হয় বন্ধ করে দিবি। যা। দাদাকে ত এই ওপরের ঘরেই থাকতে বলি, কিন্তু ওর যে ওই রাস্তার ধারের ঘরখানি না হলে কিছুতেই চলে না।

বীণা একটু হেসে সত্যিই নিচে নেমে গেল।

সন্ধ্যায় তনিমাকে কাজে যেতে হয়। ঠিক সময়েই সে গা-হাত-পা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে প্রসাধন করে ভাবলে, বীণাকে নিয়ে দাদা যদি সিনেমা দেখতে যায় ত তাকে টাকা দিয়ে যেতে হবে। অথচ সেই যে বীণা তামাক সেজে দেবার জন্যে নিচে নেমে গেছে এখনও ফেরেনি।

ঘড়ি দেখে নিচে নেমে গিয়ে তনিমা দেখলে গণপতির দরজা তখনও বন্ধ। বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে—সিনেমায় যদি যাবে ত দাদা যাও। দেরীতে গেলে টিকিট পাবে না!

ঘরের ভেতর থেকে চুড়ির শব্দ আর ফিস্ ফিস্ গলার আওয়াজ

পাওয়া গেল। মনে হলো বীণা যেন বাইরে আসতে চাচ্ছে, গণপতি জোর করে তাকে ধরে রেখেছে।

উত্তরের অপেক্ষায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জুতোর শব্দ করে তনিমা চলে যাচ্ছিল। ভেতর থেকে গণপতি চীৎকার করে বলে' দিলে—আজ আর থাক-গে তনিমা, আজ আর বায়িস্কোপ যাব না। আর একদিন গেলেই হবে।

বীণা কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, প্রথম কথাটা তার সে উচ্চারণ করেছিল, হঠাৎ স্পষ্ট মনে হলো, গণপতি যেন তার মুখখানা চেপে ধরেছে।

তনিমা মুখ টিপে একটু হেসে বাইরের দরজায় এসে ডাকলে—ট্যাক্সি।

চলন্ত ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়ালো। তনিমা তাতে উঠে বসলো।

গণপতি আজকাল আর রাস্তার লোককে ডেকে তামাক সাজতে বলে না, পিঠ চুলকে দিতেও বলে না। পাড়ার ছেলেরা আগে শুধু ওই ভয়েই এই পথ দিয়ে চলা বন্ধ করেছিল। কিন্তু আজকাল ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়িয়েছে।

পাড়ার ছোকরাগুলো—সময় নেই, অসময় নেই, জানলার শিক ধরে লাফিয়ে-লাফিয়ে ওঠে। উঁকি মেরে বলে—কি খবর দাদা? তামাক একবার খাবেন না কি?

প্রথম-প্রথম গণপতি তাদের ঘাড় নেড়ে জবাব দিত। বলত—না, এইমাত্র খেলাম।

কিন্তু দিন-দিন তারা এত-বেশি বাড়াবাড়ি সুরু করে দিয়েছে যে আব্রু রাখা দায় হয়ে উঠেছে।

জানালা বন্ধ করে দিলে ঘরের মধ্যে গরমে টেকা দায়, অথচ খুললে এই বিপদ। গণপতি একে মোটা মানুষ, সর্বাঙ্গে ঘামাচি,

ঘাম সে মোটেই সহ্য করতে পারে না বীণা তাকে ওপরের ঘরে থাকতে বলে।

গণপতি সে-চেষ্টা যে একেবারে করেনি তা নয়। কিন্তু ওপরের ঘর থেকে সে রাস্তা দেখতে পায় না। দেখতে হলে বারান্দায় এসে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখতে হয়। অথচ কি যে তার অভ্যাস, রাস্তাটি তাকে দেখতেই হবে। কিংবা নিচের এই ঘরটিতে তার আর কিছু মোহ আছে কি-না তাই-বা কে জানে!

বলে—না বীণা, এখানে আমি থাকতে পারবো না, চল নিচেই যাই!

বাধ্য হয়ে নিচের ঘরখানাতে দিনের বেলা বীণাকেও এসে বসতে হয়। আর এমনি মজা, বীণাকে দেখবার জন্যেই বোধহয় ছেলেগুলো জানলার শিক ধরে উঠে দাঁড়িয়ে সহজে আর নামতে চায় না।

সেদিন একটা ছোঁড়া বললে,—কি দাদা, বৌদি এসেছে বলে আমরা বুঝি পর হয়ে গেলাম?

গণপতি হাত নেড়ে বলে—যা-যা, ডেঁপোমি করিস নে, যা।

বীণা তখন তার পায়ের তলায় বসে এক-বুক ঘোমটা টেনে লজ্জায় ঘেমে উঠেছে!

ছোঁড়াটা তবু নড়তে চায় না।

বলে—দাদা ত বেহ্মচারী, হিঁদুর মেয়ে বিয়ে করলে নাকি দাদা?

গণপতি রেগে বলে—যা বলছি বিনয়, না হলে থুতু দেবো। বলেই সে হ্যাক্ করে বোধহয় তার গায়ে থুতু দেবার জন্যেই মুখ বাড়ায়।

ছেলেটা তখন তাড়াতাড়ি জানলা থেকে নেমে পালায়।

গণপতি এবার বীণার দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে বলে—দেখুক না শালারা! এমন বৌ ওরা বাপের জন্মে দেখেছে কেউ?

গণপতি একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বীণা বলে—ও, আমাকে দেখাবার জন্যেই বুঝি নিচে বসা হয়।

গণপতি হাসে। হেসে বলে—ইয়েস্।

বীণা বলে—কেন? আমি কি এতই সুন্দরী নাকি?

মুগ্ধদৃষ্টিতে বীণার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে গণপতি বলে—নিশ্চয়ই। নেভার মাইণ্ড।

বীণা বলে—অত সব ইংরেজী-ফিংরেজী বুঝি নে আমি।

গণপতি বলে—বুঝি না বললে ত চলবে না। শিখতে হবে।

বীণা এবার উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

গণপতির ভুঁড়িতে হাত দিয়ে বলে—হ্যাঁগা, তুমি আমায় ইংরেজী শেখাবে?

—শিখবে?

—হ্যাঁ শিখবো। লেখাপড়া শিখতে আমার ভারি সাধ।

—তাহলে কেন শেখাব না? ইয়েস্, আই স্যাল্ লার্ণ ইউ। বলেই কথাটাকে চাপা দেবার জন্যে বলে—নাও, পাটা এবার টেপো দেখি।

বীণা পা টিপতে আরম্ভ করেছে এমন সময় আর একটা ছোঁড়া উঁকি মেরে বলে—কি হচ্ছে গণুদা?

—তোর গুষ্টির মাথা হচ্ছে রে শালা! ধড়মড় করে উঠেই গণপতি তার গায়ে থুতু দিতে গিয়ে দেখে, সে পালিয়ে গেছে।

বার-বার এমনি বিরক্ত করার জন্যে তনিমা সেদিন তার সেলাই-এর কলে নিচের ঘরের ওই জানলাটার জন্যে একটা পর্দা তৈরী করে দিয়েছে। গণপতি একা যখন থাকে পর্দা সরিয়ে দেয়, আবার বীণা এলে পর্দাটা টেনে সরিয়ে দিয়ে বলে—কেমন মজা?

বীণা বলে—তনিমার বুদ্ধি খুব।

গণপতি বলে—তুমি পার না? কলে সেলাই করতে তুমি জানো না?

বীণা হেসে বলে, জানি।

—আচ্ছা, আজ তাহলে খানিকটা কাপড় আনব, আমার জন্যে একটা ফতুয়া তৈরি করে দিও দেখি।

বীণা হাসতে-হাসতে বলে—না গো না, মিছে কথা বললাম। সেলাই করতে আমি গিয়েছিলাম সেদিন, এই ছাখো এই আঙুলটায় ছুঁচ ফুটে গেছে।

বলে সে তার বাঁ হাতের চাঁপার কলির মত একটি আঙুল গণপতিকে দেখিয়ে বললে—আমাকে বিয়ে করলে, আমার কিন্তু কোন গুণ নেই। আমি ভারি বোকা।

—না না, তুমি ভারি বিউটিফুল। বলে সে তাকে জড়িয়ে ধরে বললে—আই লাভ ইউ ভেরী মাচ্।

বীণা তাকে জড়িয়ে ধরে বললে—এর মানে কি আমাকে বুঝিয়ে দাও।

গণপতি মানেটা বুঝিয়ে দিলে।

বললে—তার মানে—আমি তোমাকে খু-ব ভালবাসি।

কথাটা শুনে বীণার মনে আনন্দের আর সীমা রইলো না।

বললে—সত্যি? হ্যাগা, সত্যি? সত্যি ভালবাসো?

গণপতি বললে—হ্যাঁ, নিশ্চয়; খুব।

বীণা বললে—কোনদিন না-ভালবাসা হবে না?

ঘাড় নেড়ে গণপতি বললে—কিছুতেই না।

—মনে থাকবে ত এ-কথা?

—নিশ্চয়। নিশ্চয় থাকবে।

আনন্দে বীণা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলে না। চুপ করে সজল চোখে সে গণপতির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো।

গণপতি সেদিন বীণাকে ভাল-ভাল কাপড়-জামা পরিয়ে সিনেমা দেখতে নিয়ে গেল।

বীণা প্রথমে যেতে চায় নি, গণপতি কিছুতেই ছাড়লে না। বললে—চল, খুব ভাল বায়িস্কোপ দেখিয়ে আনি, আমি বুঝিয়ে দেবো।

বীণা বললে—আমার লজ্জা করে।

গণপতি বললে—বারে, লজ্জা করলে চলবে কেন? কই তনিমা তো বায়িস্কোপ দেখে লজ্জা করে না।

এই বলে তনিমার নজির দেখিয়ে গণপতি তাকে ঘর থেকে বাইরে আনলো।

বীণার পরণে সিল্কের শাড়ি, হাতে সোনার চুড়ি, পৌঁচি তাগা, পায়ে জরি-দেওয়া কালো ভেলভেটের জুতো। বীণাকে যেন আর কিছুদিন আগের সে-বীণা বলে চেনা দায়!

গণপতি কিন্তু কালো কিম্ভুত-কিমাকার। বীণার পাশে তাকে মানায় না।

বীণার সেদিকে লক্ষ্য নেই। গণপতি কিন্তু মাঝে-মাঝে তার নিজের গায়ের সিল্কের জামাটির দিকে তাকাচ্ছিল।

জামাটার এক জায়গায় পানের পিচ্ লেগে রাঙা হয়ে গেছে। গণপতি বার-বার পানের সেই দাগ লাগা জায়গাটার ওপর হাত দিয়ে খুঁত-খুঁত করতে লাগল।

বীণা বললে—লাগুক্‌গে, আমি কাল সাবান দিয়ে কেচে দেবো।

গণপতি বললে—পানের দাগ সাবান দিলেও ওঠে না।

বীণা তা জানতো না। বললে—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। বলে গণপতি বীণার আপাদ-মস্তক একবার ভাল করে দেখে নিলে। মনে-মনে ভাবলে, সত্যিই সে সুখী। এমন সুন্দরী স্ত্রী যার, নিশ্চয়ই সে ভাগ্যবান। তনিমাকে সে মনে-মনে আশীর্বাদ করলে। বিয়ে না করে এতদিন সে ছিল কেমন করে?

দু'জনে পাশা-পাশি চলতে-চলতে বড় রাস্তায় এসে পড়লো। ট্রাম আসতে তখনও দেরি আছে।

ট্রাম স্টপেজে ফুটপাতের ওপর দু'জনে পাশা-পাশি দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় লাল একটা গামছায় ভাতের থালা বেঁধে একটি মেয়ে রাস্তা পার হতে-হতে বীণাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

মেয়েটিকে দেখেই বীণা চিনতে পেরেছে। এ সেই অন্নপূর্ণা—যার সংগে মিসেস্ সারখেলের বাড়ি থেকে সে পালিয়ে এসেছিল। রাস্তার ওপর সেই এ্যাক্সিডেণ্টের পর অন্নপূর্ণাই তাকে পথের ওপর ছেড়ে দিয়ে সরে পড়েছিল—হাঙ্গামার ভয়ে। আজও সরে পড়বার ইচ্ছাই ছিল, কিন্তু নেহাৎ মুখোমুখি দেখা। কথা তাকে বলতেই হলো। বললে, তুমি সেই বীণা, না?

বীণা অবাক্ হয়ে তার মুখের পানে তাকিয়ে বললে—হ্যাঁ। কিন্তু তোমার এমনি চেহারা হয়ে গেছে?

সে কথার জবাব না দিয়ে মেয়েটি বললে,—তুমি আজকাল কোথায় আছ ভাই? আলাদা বাড়ি ভাড়া করেছ? তা বেশ করেছ, সারখেল দিদিমণির সংগে আবার থাকে কখনও? নেহাৎ পোড়া অদেষ্ট তাই আমরা ওর হাতে গিয়ে পড়েছিলাম। তবে তোমাকে দেখে আমরা তখনই বলাবলি করতাম যে বীণার যা চেহারা, তাতে ও যদি একলা একটা ঘর ভাড়া নিয়ে বসে তো ওর পয়সা কত লোকে খাবে। তা বেশ করেছ দিদি, আমাদের যেমন কপাল, তাই মন্দ লোকের পাল্লায় পড়ে ওই রাস্তায় গিয়ে আজ হাড়ির দুগ্গতি ভোগ করছি। তাই বলি যে, যার রূপ আছে, বাঁধন আছে, তারই এ-পথে পোষায়—যেমন ধর—তোমার।

মনের দুঃখে গড়-গড় করে এতগুলো কথা বলে মেয়েটি থামলো।

অন্নপূর্ণাকে ছাড়তেও পারছে না, অথচ না ছাড়লেও নয়। ওদিকে গণপতি দাঁড়িয়ে আছে।

অন্নপূর্ণার কথাগুলো সে শোনেনি তো? দেখলে গণপতি একটু দূরে সরে গেছে।

অন্নপূর্ণা এখন কি করছে, কেমন করে তার জীবন চলছে জানবার কৌতূহল হলো বীণার। চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলে—তুমি এখন কি করছ ভাই? আস্তে-আস্তে বল, আমার স্বামী দাঁড়িয়ে আছে।

অন্নপূর্ণা একটুখানি বিস্মিত হয়ে বললে—সোয়ামী কি লা? বাঁধা রেখেছে বুঝি? ওই কালোপানা মিন্‌ষে? টাকাকড়ি আছে লোকটার বুঝি? অনেকদিন দেখা হয় নি ভাই, কত কথা বলতে সাধ হয়। তা ঠিকানাটা তোমার দাও-না ভাই, যাব একদিন তোমার কাছে। আমার ভাই ও-সবে ঘেন্না ধরে গেছে, আর গতর বয়না দিদি, বেয়রামে ভুগে-ভুগে—

কথা তার তখনও শেষ হয়নি, গণপতি ডাকলে—কই গো এসো গাড়ি এসে গেছে।

—আসি ভাই। বলে বীণা আর শেষ পর্যন্ত না শুনেই তার স্বামীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ট্রাম তখন এসে পড়েছে। গণপতি তার হাত ধরে ট্রামে গিয়ে উঠল।

পাছে অন্নপূর্ণা আবার তার ঠিকানাটা চেয়ে বসে এই ভয়ে বীণা আর সেদিক পানে ফিরেও তাকালো না। গাড়ি ছেড়ে দিলে মুখ ফিরিয়ে একবার দেখলে শুধু।

দেখতে পেল, ভাতের থালাটা হাতে নিয়ে সতৃষ্ণ নয়নে ময়লা কাপড়খানি পরে মেয়েটা তখনও তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গণপতি জিজ্ঞাসা করলে—কে ও?

জিজ্ঞাসা করবে জানা কথা। কিন্তু বীণা তারজন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। পরিচয় দিতে গেলে সব কথাই তাকে বলতে হয়,

অথচ তনিমা তাকে এত করে বারণ করে দিয়েছে। সে বলেই বা কেমন করে? এদিকে মিথ্যে কথা বলার অভ্যাস বীণার একেবারেই নেই।

বুকের ভেতরটা তার কেমন যেন করতে লাগল। বললে—ও···ওই একটা, সেই···তুমি চিনবে না। বলব এরপর।

বলে সে চুপ করে বসে রইল।

গাড়ির সামনে পেছনে চারিদিকে পুরুষ। যেদিকে তাকায় সেইদিকেই জোড়া-জোড়া চোখের সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে যায়। সকলেই যেন তার দিকে প্যাট-প্যাট করে তাকিয়ে আছে।

নিতান্ত আড়ষ্টের মত বেঞ্চের এককোণে জড়সড় হয়ে বীণা বসে বসে শুধু অন্নপূর্ণার কথাই ভাবতে লাগল।—হে হরি, হে মা দুগ্‌গা, হে মা মনসা, স্বামী যেন তাকে আর ওকথা জিজ্ঞেস না করে।—

ট্রামের যেদিকে বীণা তাকিয়েছিল গাড়িটা একজায়গায় এসে দাঁড়াতেই দেখল, সেইদিকের ফুটপাতের ওপরই একটি কালী-মন্দির। ভেতরে মা-কালীর মূর্তি দেখা যাচ্ছে। বীণা তক্ষুনি তার হাত দুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে একটি প্রণাম করলে।

ব্যাপারটা গণপতি লক্ষ্য করেছিল কিন্তু এতগুলো লোকের সামনে কিছু বলতে পারেনি। ধর্মতলায় গাড়ি থেকে নেমেই গণপতি বললে—কালী ঠাকুরকে হাত জোড় করে প্রণাম করলে যে?

বীণা বললে—হ্যাঁ করলাম ত!

গণপতি এবার একটুখানি তিরস্কারের ভঙ্গিতে কথা বললে।

বললে—আমরা ব্রাহ্ম। হিন্দুদের ও-সব ঠাকুর-দেবতাকে প্রণাম আমাদের করতে নেই জানো না?

বীণা বললে—ওমা! সে কি? তাই বলে মা-কালীকে পেন্নাম করব না? অপরাধ হবে যে!

গণপতি বললে—না-না—ওসব আমাদের করতে নেই। আর যেন করো না।

বীণা বললে—না-গো তুমি জানো না, মা-কালী বড় জাগ্‌তো দেবতা। পেন্নাম তুমিও করো—কারও কথা শুনো না। আমাদের গাঁয়ের ভারতী ভট্‌চাজ্জের ব্যাটা সেই ন্যাপ্‌লা—মা-কালীকে একবার পেন্নাম করেনি ত তার ঘাড় মটকে দিয়েছিল।

গণপতি বললে—ধেৎ।

বলেই সে আবার জিজ্ঞাসা করলে—ও-মেয়েটি কে তা তো বললে না? ওই যে তোমার সংগে কথা বললে? গতর, বেয়ারাম কি সব যেন বলছিল—ও সব তো ভাল কথা নয়।

প্রশ্নটা বীণার বুকে এসে ধ্বক্‌ করে বাজল। সর্বনাশ! আর তো তার গোপন করা চলে না। গোপনই বা সে করবে কেমন করে? গোপন করতে সে চায় না। তনিমার নিষেধ সত্ত্বেও সে যখনই সে কথা তার মনে হচ্ছে তখনই সে ভাবছে—এটা তার অপরাধ।

বীণা বললে—বলব—চল বাড়ি গিয়ে। এমন করে পথে যেতে যেতে বলতে পারব না। সে অনেক কথা।

গণপতি কেন যেন এটা জানবার অত্যন্ত কৌতূহল হলো। বললে—চল তাহলে সিনেমা দেখতে দেখতে বলবে।

—বেশ তাই বলব চল। বলে ছ'জনে সিনেমায় গিয়ে দেখল, টিকিট-ঘর বন্ধ হয়ে গেছে।

অগত্যা বাড়ি ফিরে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

গণপতি বললে—যাক গে, পয়সাটা বেঁচে গেল। আর একদিন আসা যাবে।

এই বলে বীণার হাত ধরে ঠিক সাহেব-মেমের মত বুকের ছাতি

ফুলিয়ে গণপতি মিউনিসিপ্যাল মার্কেটটা বার-কতক ঘুরে ফিরে বললে—দেখেছ এমন মার্কেট কখনও ?

দেখে বীণা সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। বললে—ভারি সুন্দর। ভাগ্যিস্ তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল।

কথাটা শুনে গণপতির মুখে হাসি যেন আর ধরে না। বললে—খাবে কিছু ?

ঘন ঘন ঘাড় নেড়ে বীণা বললে—না না না, তাই খায়! ছিঃ, জাত যাবে যে! এখানে ত সাহেবরা খায়।

গণপতি বললে—এ হে হে হে, তুমি একেবারে ভিলেজিয়ান, কিছু জানো না।

বীণা বললে—না বাপু, আমি অত সব কেমন করে জানব বল ? কিন্তু ছাখো, আর আমি কখনও এখানে আসব না।

—কেন ?

বীণা সলজ্জভাবে বললে—তুমি তখন দেখতে পেলে না, ওই-দিকে তাকিয়ে ছিলে। সেই সময় একটা লোক আমাকে হাতের ইসারা করে ডাকছিল।

গণপতি বললে—ধেৎ, ডাকবে কি রকম ? তাই আবার কেউ কাউকে ডাকে নাকি কখনও ?

বীণা বললে—হ্যাঁ, সত্যি বলছি, সেই যে সব সাজানো-গোছানো ঘরগুলো রয়েছে না, সেইখানে। হাত বাড়িয়ে লোকটা আমায় ধরে আর কি! আর একটু হলে আমি চেঁচিয়ে উঠতাম।

গণপতি বললে—ওগুলো দোকান। জিনিষ কেনবার জন্যে ডাকছিল। বুঝলে ?

বীণা বললে—কে জানে বাপু, তা হবে হয়ত। আমি আর আসব না, আমার ভয় করে!

কিন্তু আসল কথাটা গণপতি ভোলেনি। সেখান থেকে বীণাকে গড়ের মাঠে নিয়ে গিয়ে ঘাসের ওপর দুজনে পাশাপাশি বসলো।

বীণা বললে—বাঃ দিব্যি মাঠ ত। হ্যাঁ গা, এখানে অনেক সব গরু চরে ?

গণপতি বললে—না। তুমি সেই কি অনেক কথা বলবে বলেছিলে, বল এইবার শুনি, তারপর বাড়ি যাব।

বীণার বুকের ভেতরটা কেমন যেন একটা অজানা আশঙ্কায় দুর দুর করতে লাগল। একটা ঢোক গিলে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে—বলি, মন দিয়ে শোনো।

তারপর কিছুক্ষণ ধরে কি যেন ভাবলে সে। বললে—তুমি বল, তুমি সে-কথা আর কাউকে বলবে না। তনিমাকেও না।

গণপতি বললে—না বলবো না।

—আমার ওপর রাগ করবে না ?

—না।

—আচ্ছা সেই যা বললে সেদিন, হ্যাঁ গা—বলে বীণা তার কোল ঘেঁষে আর একটুখানি সরে এসে গণপতির জামার একটা বোতামে হাত দিয়ে বললে—তুমি আমায় খুব ভালবাসো, না ?

গণপতি এবার তাকে একহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললে—হ্যাঁ, সত্যি, মাইরি ভালবাসি।

বীণা তার সেই সরল মুখখানি ওপরের দিকে তুলে আবার জিজ্ঞাসা করলে—কক্‌খনো না-ভালবাসা হবে না ? বল—আমার গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি কর।

গণপতি তাই করলে।

—তবে শোনো।

বলে বীণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

তারপর সেই অন্নপূর্ণা মেয়েটির সঙ্গে কোথায় তার পরিচয় সব কথা একে একে বলতে সুরু করে দিলে।

বলতে গিয়ে সরল বিশ্বাসে সহজ-কণ্ঠে সে তার দীনুদাদা থেকে

আরম্ভ করে জীবনের বর্তমান পর্যন্ত সব ঘটনা একটির পর একটি বলে ফেললে।

প্রায় একঘণ্টা সময় লাগল তার সবটুকু গল্প বলে শেষ করতে।

সম্পূর্ণ বলা শেষ হলে বীণা তাকিয়ে দেখে গণপতি উদাসদৃষ্টিতে তার সামনের আলোকোজ্জ্বল চৌরঙ্গির বিশাল বাড়িগুলির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

বীণা বললে—হলো ত? শুনলে ত? কিন্তু দেখো যেন তনিমাকে কোনদিন বলে ফেলো না, আর সেই যে—সে ত গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়েছি।

গণপতি তার মুখের দিকে একবার তাকালে।

এমন একাগ্র দৃষ্টিতে সে কখনও তাকায় না।

তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—ওঠো।

বলে নিজেই উঠে দাঁড়ালো।

বীণা তার হাত ধরে বললে—বোসো না গো। বলা শেষ হলো আর উঠবে? রাগ করলে নাকি?

গণপতি আবার বসলো। বললে—রাগ? না।

কিন্তু জবাব শুনে বীণার কেমন যেন মনে হলো—সত্যিই সে রাগ করেছে।

অথচ গণপতির এমনি বোকা-বোকা মুখ যে রাগ-অভিমান সুখ-দুঃখ—মুখের ওপর যেন কোন কিছুরই ছাপ পড়ে না—মুখ দেখে সহসা কিছু বোঝা যায় না।

বীণা বললে—রাগ করো না বাপু আমার কোনও দোষ নেই।

তনিমাকে আমি বলেছিলাম—না ভাই, বিয়ে আমি করব নাকো আগে সব কথা শুনিয়ে দে, তাতেও যদি বিয়ে করে ত করুক। নইলে দরকার নেই।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর গণপতিই প্রথমে বলে উঠল—তনিমা কি বললে?

—বললে তাতে কি হয়েছে, তুই ত আর ইচ্ছে করে কিছু করিসনি, অমন কত হয়।

বলেই সে গণপতির মুখের দিকে নিতান্ত অসহায়ের মত একাগ্র-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আপন মনেই ভাবতে লাগল, হয়ত তনিমার কথাই ঠিক। না বলাই তার উচিত ছিল, বলা তার অন্যায় হয়েছে।

কিন্তু সেই বা কি করবে? তনিমার আদেশমত চুপ করেই সে ছিল—হঠাৎ রাস্তায় ওই অন্নপূর্ণাই ত সব গোলমাল করে দিলে।

বীণার রাগ হলো অন্নপূর্ণার ওপর।

কিন্তু গণপতি কি সত্যিই রেগেছে? বীণা তার কোলের উপর হাত রেখে আবার জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁগা, সত্যিই আমার ওপর রাগ করলে? বেশ, তাহলে এবার আমি কি করব জানো?

গণপতি জিজ্ঞাসা করলে—কি?

বীণা হঠাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে। বললে—তাহলে আমি এবার সত্যিই মরব।

গণপতির ভয় হলো।

বৌ মরার দুঃখ সে জানে। কাপড়ে আগুন ধরিয়ে কি এমনি একটা কিছু করে যদি মরে ত তার হাঙ্গামা অনেক। হাত পা বাঁধা পড়তে পারে, জেল হওয়াও বিচিত্র নয়।

গণপতি মনে মনে কল্পনা করে নিলে—তাদের বাড়ির সেই নিচেকার ঘরখানির নিরুপদ্রব শান্তি, শুয়ে শুয়ে আরাম করে তামাক খাওয়া, বীণার এত সেবা-শুশ্রূষা, এসব থেকে বঞ্চিত হওয়ার মত

নিদারুণ কষ্ট পৃথিবীতে আর কিছু আছে কিনা কে জানে। আর তা ছাড়া বীণার মত সুন্দরী স্ত্রী—

গণপতির চিন্তার ধারা এইখানেই রুদ্ধ হয়ে গেল। হাত দিয়ে বীণাকে জড়িয়ে ধরে নিজেকেই যেন নিজে ভোলাবার জন্যে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চীৎকার করে উঠলো—নো নো নো—আই স্যাল নট বিকাম এংগ্রি আপন ইউ।

হাব-ভাব দেখে বীণা মাত্র এইটুকু বুঝল যে, এটা রাগের কথা নয়। জিজ্ঞাসা করলে—তার মানে?

গণপতি প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—নাঃ, রাগ কেন করব? কিন্তু আর যেন—

বীণা বললে—আর যেন—কি?

—কিছু না। ওঠো, চল বাড়ি যাই। এখানে অনেক লোক জড়ো হয়ে যাচ্ছে।

কথাটা মিথ্যা নয়। যে জায়গায় তারা বসেছিল, সে রকম জায়গায় স্বামী-স্ত্রীতে অমন করে সাধারণতঃ কেউ বসে না। এক-একজন করে বোধহয় মজা দেখবার জন্যেই লোকজন এসে তাদের চারদিকে বসে পড়েছিল।

বসে আর কিছুতেই উঠতে চায় না।

সুতরাং বাধ্য হয়ে তাদের উঠতেই হলো।

আবার ট্রামে চড়েই তারা বাড়ি ফিরছিল। ঠন্‌ঠনে কালীবাড়ির কাছে গাড়ি এসে দাঁড়াতেই বীণা আবার তার হাত দু'টি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে যেমনি প্রণাম করতে যাবে, গণপতি তার হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—এই!

কথাটা সে এত জোরে বলে বসলো যে, বীণা সহসা চম্‌কে উঠে ভয়ে-ভয়ে হাত দু'টি তার নামিয়ে রাখলে।

কাছাকাছি যাঁরা বসেছিলেন, ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে না পেরে

এই নব-দম্পতির দিকে ঘন ঘন তাঁরা তাঁদের কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

একপাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে বসে বীণা শুধু গণপতির মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে চলল। মা কালীকে প্রণাম করতে না পেরে ক্ষুব্ধমনে সে শুধু মনে মনে বলতে লাগলো—অপরাধ নিয়ো না মা, স্বামী আমার বড় নির্বোধ।

বাড়ি ফিরে দেখলে, দরজায় একটা কালো রঙের মোটর দাঁড়িয়ে।

তনিমাও বোধহয় এইমাত্র বাড়ি ফিরেছে।

গণপতি বললে—অলকবাবুর গাড়ি।

স্বামী তার এতক্ষণে কথা বললে। বীণা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। রাগ তা হলে সে করেনি। গণপতির হাতখানা ধরে সে জিজ্ঞাসা করলে—অলকবাবু খুব বড়লোক, না?

ঘাড় নেড়ে গণপতি বললে—হ্যাঁ, ডাক্তার। বড়লোকের ছেলে।

বীণা বললে—অলকবাবুর চেহারাটি চমৎকার। না?

গণপতি তার ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজার কাছে থম্‌কে দাঁড়ালো। সিঁড়ির কাছে যে ইলেকট্রিকের আলোটা জ্বলছিল, তার আলোয় বীণা একবার গণপতির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে, মুখে তার রাগের চিহ্ন। কেউ কোন কথা বললে না।

বীণা প্রথমে ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বাললে। বললে—বসো তুমি ততক্ষণ, জামাটামা খোল। আমিও এগুলো ওপরে খুলে রেখেই আসছি। বাবাঃ, কতক্ষণ ধরে পরে আছি বল ত!

বলে বীণা চলে যাচ্ছিল। গণপতি খপ্‌ করে তার হাতখানা চেপে ধরে বললে—দাঁড়াও, কথা আছে।

গণপতি বললে—দরজাটা যে হাঁ করে খুলে রাখছো, অলকবাবু বেরোবে যখন, তাকে দেখবার জন্যে খুলে রাখলে নাকি?

এ আবার কি রকম কথা।

কথাটার অর্থ বীণা ঠিক বুঝতে পারলে না। ধীরে ধীরে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে বসে বললে—অলকবাবুকে ত আমি অনেকবার দেখেছি।

গণপতি তক্তপোষের ওপর বসে পড়ে গায়ের জামাটা খুলতে খুলতে শুধু বললে—হুঁ।

জামাটা খুলে বীণার হাতে দিয়ে বললে—রাখো। রেখে এইখানে এসে বোসো।

বীণা তার পায়ের জুতো খুলে ফেলে জামাটা হাতে নিয়ে দেওয়ালের গায়ে ব্রাকেটে ঝুলিয়ে রেখে গণপতির পাশে এসে বসলো।

গণপতি জিজ্ঞাসা করলে—অলকবাবুর সঙ্গে তুমি কথা কও ?

ঘাড় নেড়ে বীণা বললে—হ্যাঁ।

গণপতি বললে—কেন, কেন ? ভাল চেহারা বলে ওকে তোমার খুব ভাল লাগে বুঝি ?

এতক্ষণ পরে বীণা তার কথার মানেটা কতক বুঝল। ভয়ে ভয়ে বললে—না, আমি চাইনি কথা কইতে, তনিমা সেদিন জোর করে বললে—কথা না কইলে রাগ করব।

হুঁ, বলে গণপতি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—তোমারও কথা কইবার ইচ্ছে ছিল তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।

বীণা বললে—না গো না, আমার ইচ্ছে ছিল না—সত্যি বলছি, আমার কপাল বড় খারাপ। তোমাকে পেয়েছি আর আমার কিছু চাই না।

গণপতি বললে—হ্যাঁ এই ত কথার মত কথা। যা করেছ করেছ, এখন বিয়ে হয়ে গেছে—বাস্, আর কি! ইউ লভ্ মি এণ্ড আই স্যাল্ মাষ্ট লভ্ ইউ।

বলে সে বীণার একটি হাত ধরে বললে—যাও তুমি ঘেমে উঠেছ, ভাল জামা-কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে, এগুলো বদলে এসো। কিন্তু ভাখো

আমি যা বললাম—স্বামী দেখতে যতই খারাপ হোক না, হাজবেণ্ডকে ভালবাসা ওয়াইফের ডিউটি, তা যেন মনে থাকে।

বীণা মাথা নিচু করে বসে বসে কথাগুলো শুনছিল, গণপতি এতক্ষণ দেখতে পায়নি, এবার তার মুখের দিকে চাইতেই দেখতে পেল তার চোখ দিয়ে টস্-টস্ করে জল পড়ছে।

গণপতি বললে—ছি! কাঁদছ তুমি? কেন কাঁদবার কথা ত আমি কিছু বলিনি। যাও জামা-কাপড় ছেড়ে এসো।

ঘাড় নেড়ে বীণা বললে—না।

—কেন?

বীণা বললে—না। অলকবাবু যাক আগে।

গণপতি বললে—থাক না সে। তুমি তার কাছে যেয়ো না, তার দিকে তাকিয়ো না, কথা বলো না—বাস্। পাশের ঘরে যাও, ধীরে ধীরে কাপড়-জামা বদলে আবার চলে এসো।

বলে বীণাকে একরকম জোর করেই সে সেখান থেকে তুলে দিলে।

বীণা আর মুখ দিয়ে একটি কথাও বলতে পারলে না। শুধু সে তার স্বামীর মুখের দিকে তার বড়-বড় চোখ দুটি তুলে অত্যন্ত সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি মিনতি জানালে তা একমাত্র অন্তর্য্যামীই জানলেন। গণপতি তার বিন্দুবিসর্গও টের পেলে না। সে শুধু তাকে এই বলে সাবধান করে দিলে যে অলকবাবুর সম্বন্ধে তাদের যে আলোচনা হয়েছে সে-কথা তনিমা যেন কিছু জানতে না পারে।

নীরবে একবার ঘাড় নেড়ে বীণা তার জুতো জোড়াটা হাতে নিয়ে ধীরে-ধীরে বের হয়ে গেল।

ওপরে গিয়ে দেখলে তনিমার ঘরের দরজা বন্ধ। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দরজা বন্ধ করে কথা বলতে তনিমাকে বীণা কোনদিন দেখেনি, আজ এই প্রথম দেখলে। গণপতির কথাটাই তার বেশি করে মনে হলো। মনে হলো, স্বামী তাকে সাবধান করে দিয়ে বড় ভাল কাজ

করেছে। অলকবাবু লোক হয়ত সত্যিই ভাল নয়, তার সঙ্গে কথা বলা, তার কাছে যাওয়া নিরাপদ হয়ত নাও হতে পারে। কিন্তু তনিমা?···বীণা আর বেশি কিছু ভাবতে পারল না। ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে পাশের ঘরের দরজা খুলে সে ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে কাপড়-জামা বদল করতে লাগল।

পাশাপাশি এই দুটো ঘরের মাঝখানের একটা দরজা দিয়ে পাশের ঘরে যাওয়া যায়। তনিমা সেই দরজাটা খুলে খালি-পায়ে কাপড়ের আঁচলটা গায়ে জড়াতে-জড়াতে এ-ঘরে এসে বললে—বা-রে! সাড়া দিলিনে যে? এরই মধ্যে চলে এলি কি রকম? সিনেমা ত এখনও—

ঘাড় নেড়ে অত্যন্ত চুপিচুপি বীণা বললে—বায়োস্কোপ আমরা দেখিনি।

—কেন?

---টিকিট পেলাম না।

তনিমা বললে—সে কি রে। ট্যাক্সিতে গিয়েও টিকিট পেলি না?

বীণা বললে—ট্যাক্সিতে ত যাইনি—ট্রামে।

তনিমা হাসতে লাগল—ও। আমার কাছে ট্যাক্সির ভাড়া নিয়ে দাদা বুঝি পয়সাগুলো বাঁচালে? আয়, বসে-বসে গল্প করি!

বলে সে তার হাত ধরতেই হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বীণা বললে—না ভাই অলকবাবু—

তনিমা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—কোথায় অলকবাবু?

বীণা বললে—তোর ঘরে!

তনিমা হেসে উঠলো। বললে—অলকবাবুকে নিয়ে বুঝি আমি খিল বন্ধ করে বসে আছি? আমি বসে-বসে চিঠি লিখছিলাম।

এই বলে বীণাকে টানতে-টানতে দরজা খুলে তনিমা তার নিজের ঘরে এসে দাঁড়ালো। দেখা গেল, কেউ কোথাও নেই।

বীণা বললে—তবে যে মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজায়?

তনিমা বললে—হ্যাঁ, মোটরটা অলকবাবুর। ওতেই আমি এসেছি আবার খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে যাব। রাত্রে ডিউটি।

বীণা একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। তনিমার সঙ্গে তার খাটে এসে বসল। মুখখানা ভার-ভার। পাশেই টেবিলের ওপর চিঠির কাগজ, খাম, সব ছড়ানো। বীণা সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দেখে তনিমা জিজ্ঞাসা করলে—কি দেখছিস? কাকে লিখছিলাম বল্ দেখি?

বীণা বললে—কি জানি ভাই, আমি ত পড়তে জানিনে। বলেই সে একটু হেসে বললে—অলকবাবুকে, না?

ঘাড় নেড়ে তনিমা বললে—হেরে গেলি। অলকবাবুকে অত ভাল আমি বাসিনে যে সন্ধ্যেবেলা একলা ঘরে বসে-বসে তাকে আমি চিঠি লিখতে যাব। আয়, ভাল করে চেপে বোস্।

বলে বীণাকে তার আরও কাছে টেনে এনে বললে—বলতে পারলিনে তো?

বীণা বললে—না।

তনিমা এবার হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে লেখা চিঠির কাগজখানা টেনে এনে বললে—শোন্। নাম বলব না কিন্তু, চিঠিখানা পড়ে শোনাই। শুনে বলতে হবে কাকে লিখেছি।

এই বলে তনিমা চিঠি পড়তে লাগল।

'সেই যে তুমি রাগ করে মুখ ফিরিয়ে কথা না বলে চলে গেলে তারপর আর দেখা নেই। কেন বলত—এত রাগ কেন? এ তো ভাল লক্ষণ নয়। তুমি আমায় ভালবাসো বলে কি কারও সঙ্গে

আমায় কথা পর্যন্ত বলতে দেবে না? কুমারবাবু তোমার কি ক্ষতি করেছেন শুনি? মাথায় তাঁর ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল ছিল। সেদিন চুলগুলো তিনি কেটে ফেলেছিলেন। ভাল দেখাচ্ছিল না। তাই বললাম, চুল আর আপনি কাটবেন না কুমারবাবু, চুল থাকলেই আপনাকে বেশ ভাল দেখায়। আর ত কিছু বলিনি। এ আর এমন কী মারাত্মক কথা হলো?

কিন্তু কথাটা বলেই আমি তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি—সর্বনাশ! ঝড় উঠেছে। হাতের কাছে রিভলবার কি অমনি একটা কিছু থাকলে বোধহয় তখন তুমি তাদের দু'জনকেই খুন করে ফেলতে। আমার দুর্ভাগ্য কি তোমার দুর্ভাগ্য ঠিক জানিনে, খুন করা আর হলো না. তুমি উঠে গেলে। তারপর থেকেই তুমি নিরুদ্দেশ। তুমি যাবার পর কুমারবাবু বোধহয় এক মিনিটও আমার কাছে ছিলেন না। তিনি আর আসেনও নি। আসুন আর নাই আসুন আমার কিছু আসে যায় না, কিন্তু তোমার কি-রকম ব্যবহার বলত?

আজ তার উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছি তোমাকে। ডাক্তারখানার পাশে তোমার খালি মোটরটা দাঁড়িয়ে আছে দেখে ভারি একটা দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় ঢুকলো। তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসে সোফারকে বললুম— চালাও। তারপর তোমার গাড়িখানা আমার দরজায় ফেলে রেখেছি! থাক্ ওইখানে দাঁড়িয়ে।

গাড়ির জন্যে তুমি ছট্‌ফট্ করে বেড়াচ্ছ, ট্রামে চড়ে ট্যাক্সিতে চড়ে কলে যাচ্ছ—ভেবে আমি ভারি সুখ পাচ্ছি! পথে আসতে আসতে ভয়ানক একটা 'এ্যাক্সিডেন্ট' হয়ে তোমার গাড়ীটা ভেঙে চুরমার হয়ে যেতো ত আমার ভারি আনন্দ হতো। তা আর হলো না। তোমার নন্দ সোফার বোকা হলেও গাড়ি চালাতে সে জানে।

নাঃ আর কষ্ট তোমায় দেবো না। নন্দর হাতেই চিঠিখানা তোমায় পাঠালুম। চিঠি পেয়ে তখন আর আমায় খোঁজ করতে এসো না যেন।

বাড়িতে থাকলেও দরজা আমি খুলব না। তার কারণ আমার সহচরী বীণা—তোমার মত সুন্দর লোকগুলোকে ভারি পছন্দ করে। ইতি— তোমারই—ত—

শেষের কথাটা শুনে বীণা তাকে এক চড় মেরে বললে—যাঃ, ওটা ভাই তুই কেটে দে। ওকি?

তনিমা বললে—তা না-হয় দেবো, কিন্তু বল কাকে লিখেছি?

বীণা বললে—জানি না। ও কথাটা তুই কেটে ফ্যাল, নইলে ও-চিঠি আমি জোর করে ছিঁড়ে দেবো।

তনিমা হেসে বললে—না-রে না, তা আমি লিখিনি, ওটা আমি এমনি দুষ্টুমি করে বললুম। তুই ঠিক বলেছিলি, চিঠি আমি অলকবাবুকেই লিখেছি।

বীণা কিন্তু সেই এক-কথাই ধরে রইলো—সত্যি বলছিস ত? লিখিসনি ত? লিখেছিস ত তোর হাতে ধরে বলছি তুই কেটে দে।

তনিমা বললে—না-রে না, লিখিনি—লিখিনি বাবাঃ। এত ভয় কেন? লিখলামই-বা। ওইটে পড়ে অলকবাবুর মত অমন সুন্দর একটি মানুষ তোকে যদি ভালই বেসে ফ্যালে ত মন্দ কি? ভালবাসাকে এত অবহেলা করতে নেই হতভাগী—ভালবাসার জন্যে কত মেয়েকে আমি পথে-পথে কেঁদে বেড়াতে দেখেছি—তা জানিস? একটা মেয়েকে আমি জানি—আমাদের সঙ্গে পড়তো—শোন্ তবে গল্প শোন বীণা আয় শো আমার কাছে।

বলে বীণাকে তার পাশে শুইয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললে—মেয়েটির নাম চপলা। সুন্দরী তাকে বলা চলে না। তবে যৌবনকাল, সেজে-গুজে বেশ ফিটফাট হয়ে থাকতো। বেচারা চিরকাল শুধু নিজে ভালবেসেই মলো, কেউ আর তাকে ভালবাসলে না। এক-একদিন আমার কাছে এসে সে তার ভালবাসার কথা বলতো আর কাঁদতো। সে কান্না যদি তুই দেখতিস বীণা। আহা বেচারা! আজ তার জন্যে আমার কষ্ট হয়। যাকে সে দু'দিনের জন্যে কাছে

পেতো তাকেই সে তার সর্বস্ব দিয়ে ভালবেসে ফেলতো। কিন্তু নিষ্ঠুর এই পুরুষ জাতটা এমনি স্বার্থপর যে দু'দিন বাদে তাকে তারা পায়ে দলে চলে যেতো—মেয়েটার দিকে ফিরেও একবার চাইতো না। কিন্তু এমনি মজা ভাই, চপলাকে আমি এত করে বোঝাতাম, বলতাম আর ঠকিসনে হতভাগী, অত সহজে এই স্বার্থপর জাতটাকে বিশ্বাস করিসনে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। কিছুদিন পরেই দেখতাম মুখে হাসি ফুটেছে। সাজ-গোজ আর তেমন ভাল করে করে না। সদা-সর্বদাই কেমন যেন একটা বিহ্বল ভাব। হেসে বলতাম, আবার কাউকে পেয়েছিস বুঝি? চপলা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলতো, এতদিন পরে মনে হচ্ছে যেন পেলাম। বলে সে তার প্রিয়তমের চিঠি আমায় দেখাতো। জোরে-জোরে পড়ে-পড়ে আমায় শোনাতো। বলতো—দেখেছিস? লিখেছে—মানুষের বাইরের রূপটাই কি সর্বস্ব নাকি? তোমার ভালবাসাকে আমি অগ্রাহ্য করি কেমন করে রাণী? তা যদি করি তাহলে যে আমার পাপ হবে।—মনে মনে হাসতাম। কিছুদিন পরেই দেখি—বাইরের রূপকে অগ্রাহ্য করে অন্তরের রূপ যিনি দেখেছিলেন তার সেই মহা-পুরুষটি হঠাৎ অন্তর্ধান করেছেন। কোথায় যে পালিয়ে গেছেন তার আর উদ্দেশ মেলে না।

বীণা বললে—আহা বেচারা! শেষপর্যন্ত কি হোল তার?

তনিমা বললে—কি আর হবে! হাজার হোক বোকা মেয়ে ত। মার কাছে একদিন ধরা পড়লো। দেখে-শুনে একটা বিয়ে দিয়ে মা তাকে শ্বশুরবাড়ী বিদেয় করে দিলে। আমি ভেবেছিলাম এবার বুঝি মেয়েটা সুখে থাকবে, কিন্তু সুখ তার অদৃষ্টে নেই। শুনলাম স্বামী তার মারধোর করে। চপলা পড়ে-পড়ে মার খায় আর কাঁদে। দু'একটা ছেলেমেয়েও হয়েছে। একবার একখানা চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল—আমি ভাই বিষ খেয়ে মরব। হয় বিষ খেয়ে, নয় জলে

ডুবে, নয় গলায় দড়ি দিয়ে—যেমন করে পারি আত্মহত্যা করব আর পারছিনে। আমার এই চিঠি পাবার পর জানবি আমি মরেছি। মরবার আগে তোকে বড় বেশি করে মনে পড়লো তাই চিঠি লিখলাম।

বীণা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিল। বললে—মরেছে?

বলতে বলতে সেই অদেখা চপলার দুঃখে বীণার চোখ দুটো জলে ভরে এলো।

তনিমা বললে—পাগল হয়েছিস? মলে ত সব দুঃখুই চুকে যেতো। শান্তি পেতো। মরেনি। তারপরও মাঝে একবার তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। মুখে সেই চির-দুখিনীর ছাপ, বিয়ে যখন করেনি তখন যদিই-বা দু-একদিনের জন্যে ভালাবাসার অভিনয়কেও ভালবাসা ভেবে সুখে থাকতো—এখন আর সে-আশাও নেই। মরতে সে পারে না—মরবে না—অমনি করে বেঁচে থেকে দুঃখভোগ করবে।

এই বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তনিমা বললে—ও-সব মেয়ের জীবনের ট্র্যাজিডিই হচ্ছে ওই।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে রইলো।

তারপর তনিমাই প্রথমে বললে—কিন্তু ছাখ বীণা, ওই পুরুষ জাতটাই অমনি স্বার্থপর। ভালবাসার মর্যাদা ওরা দেয় না। ওরা চায় আমাদের রূপ, যৌবন, আমাদের দেহ। কিন্তু ওরা জব্দ হয় কোথায় জানিস? জব্দ হয়—আমার মত মেয়ের কাছে। যেসব মেয়ের রূপ আছে তারাই ওদের জব্দ করতে পারে। আর জব্দ করাই উচিত। আমাদের পায়ে এসে ওরা লুটিয়ে পড়বে, ভালবাসা ভিক্ষা করবে, ছুটোছুটি করে বেড়াবে, কাঁদবে, দুঃখ করবে, আর আমরা থাকব নির্বিকার। সে-সব যেন আমাদের স্পর্শও না করে। যে যত খুশী আমাদের ভালবাসা নিবেদন করতে চায়—করুক। পুরুষের ভালবাসা আমাদের দিনরাত ঘিরে থাকবে, ওদের নিয়ে আমরা ছিনিমিনি খেলব, বিনিময়ে দেবো শুধুমাত্র একটুখানি হাসি, একটু স্পর্শ—জিইয়ে রাখবার জন্যে একটুখানি অভিমান,একটুখানি অভিনয়।

উত্তেজনার মুখে কথাগুলো বলে তনিমা চোখ তুলে দেখলে—বীণা তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। বললে—কথাগুলো আমার তুই কিছু বুঝতে পারলি না, না? আচ্ছা দাঁড়া, তোকে সোজা করে বুঝিয়ে দিই—শোন্। ছাখ, অলকবাবু আমাকে চায়। অমন অনেক অলকবাবুই আমাকে চেয়েছে কিন্তু ওই চাওয়াই তাদের সার হয়েছে। তারা ভেবেছে হয়ত পেলুম, আসলে কিন্তু তাদের কাছ থেকে নিয়েছি মাত্র, দিইনি কিছু। কেন দেবো? ক্রমাগত দিয়েই যদি যেতুম তাহলে আজ আমারও অবস্থা হতো ঠিক ওই চপলার মত। তার মত সারা জীবনভোর কাঁদতে আমি চাইনে, এবার বুঝলি?

ঘাড় নেড়ে বীণা বললে—হুঁ।

ছাই বুঝেছিস। আচ্ছা কাল যদি অলকবাবু কি ধর এমনি আর একজন সুন্দর পুরুষ এসে তোকে তার ভালবাসা জানায়, জানিয়ে বলে—তোমায় না পেলে আমি আত্মহত্যা করব. পারবি তার সে ভালবাসা নিতে? পারবি ভালবাসার অভিনয় করতে?

বীণা যেন শিউরে উঠল। বললে—না ভাই, কিছুতেই না। তোর দাদা যদি জানতে পারে তাহলে আমায় খুন করে ফেলবে।

তনিমা হাসল। বললে—ধর্ এমন ব্যবস্থা যদি আমি করে দিই যাতে আমার দাদা কিছু টেরও পাবে না, তাহলে পারিস?

বীণা বললে—না ভাই, তাও পারি না।

তনিমা বললে—তাহলেই মরেছিস। আচ্ছা তুই কি মনে করিস দাদা তোকে সত্যিই ভালবাসে? আজ না হয় তোর রূপ আছে, যৌবন আছে কিন্তু এমন একদিন ত হবে যেদিন ও রূপও থাকবে না যৌবনও থাকবে না, তখন? তখনও তোর স্বামী তোকে এমনি করে ভালবাসবে—তোর বিশ্বাস?

বীণা বললে—কি জানি ভাই অতশত জানিটানি না। ওর পায়ে মাথা রেখে এখন মরতে পারলেই বাঁচি।

তাই যেন মরিস তুই, আমি আশীর্বাদ করছি। বলে তনিমা তার মাথায় হাত রেখে হো-হো করে হাসতে লাগল। বললে—তুই আমার বৌদি হোস্, বলতে নেই, তাহলেও বলছি।

হাসি থামলে বললে—বয়ে গেল। কে কোথায় কোন্ মুখপোড়া আমাদের ভালবাসলো না কি করলো বয়ে গেল। ভগবান আমাদের রূপ দিয়েছেন বলে আজ ওরা এসে আমাদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ছে। রূপ যদি না দিতো আর ওদের ভালবেসে যদি কেঁদে-কেঁদে মরেও যেতুম ত ওরা ভুলেও আমাদের দিকে তাকাতো না।

আরও কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, দরজায় হঠাৎ ঠক্‌ঠক্ করে শব্দ হলো। বীণা ধরমড় করে উঠে বসলো। তনিমা বললে—কে?

—খোল।

গণপতির ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর।

কাপড়টা ভাল করে পরে তনিমা দরজা খুলে দিলে। হাসতে হাসতে বললে—ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি?

গণপতি ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে—অলকবাবু গেল কোথায়?

তনিমা বললে—অলকবাবু ত কই আসেনি দাদা। তোমরা দুজনেই কি স্বপ্ন দেখছ নাকি? বৌদিও এসে বলে—অলকবাবু, তুমিও বল অলকবাবু—ব্যাপার কি?

গণপতি খানিকটা শান্তমূর্তি ধারণ করে বললে—ও, অলকবাবু আজ আসেইনি তাহলে। তাহলে আমাদেরই ফরগেটিং।

তনিমা বললে—অলকবাবুর মোটর আমাদের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে বলেই ভেবেছ বুঝি—

ঘাড় নেড়ে গণপতি বললে—হ্যাঁ।

তনিমা বললে—ও মোটর আমিই এনেছি।

বলে দেয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে—আমরা

তাহলে এবার খেয়ে নিই বীণা, আমাকে আবার খেয়েই বেরোতে হবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর অলকবাবুকে লেখা চিঠিখানি তনিমা তার সোফারের হাতে দিয়ে বললে—চিঠিখানি তোমার বাবুকে দিয়ে দেবে। এতেই সব লিখে দিয়েছি। তোমায় তিনি কিছু বলবেন না। যাও।

মোটর নিয়ে সোফার চলে গেল। সে যাবার পর সেই যে তনিমা বের হলো—বাড়ি ঢুকলো পরদিন সকালে।

জরি-দেওয়া কালো ভেলভেটের জুতো পায়ে দিয়ে, ছাপা সিল্কের শাড়ি পরে ভাড়াটে একটা ট্যাক্সি থেকে তনিমা নামলো। গত রাত্রে তনিমা যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় বীণা তখন তার সাজ-সজ্জা ততটা লক্ষ্য করেনি। এতক্ষণে হঠাৎ তার সেইদিকে নজর পড়তেই বীণা জিজ্ঞাসা করলে—ওরকম কাপড়-চোপড় পরে ত কোনদিন তুই কাজে বেরোস না তনিমা, কাল কি তবে কাজে যাসনি ?

তনিমা ম্লান একটু হেসে কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে ইজিচেয়ারে ঢলে পড়লো। জুতো দুটি খুলে ফেলে সেই নিটোল, সুন্দর, শুভ্র পা দুটি চেয়ারের ওপর তুলে দিয়ে বললে—কেন বলুন ত বৌদি, আমাকে কি আপনার সন্দেহ হচ্ছে ?

উপহাসটা বীণা, বোকা হলেও বুঝলো। তার কাছে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারের হাতলে বসে পড়ে বীণা বললে—না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

চেয়ারের গায়ে মাথা হেলিয়ে গ্রীবা বেঁকিয়ে চোখ তুলে তনিমা বললে—সত্যি শুনতে চাস্ ? কিন্তু বলতে তোর কাছে ভয় করে।

বীণার কি কৌতূহল হলো কে জানে! এমন কৌতূহল সচরাচর তার হয় না। বললে—হ্যাঁ, সত্যি না ত কি মিথ্যা বলছি। আমার ভাই মিছে কথা বলতে গলায় কেমন যেন আট্‌কে যায়।

তনিমা বললে—আমার ঠিক উল্‌টো। এমন মিছে কথা এক এক সময় বলি যে, নিজেই ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠি।

বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তনিমা হাত বাড়িয়ে বীণার হাতখানা চেপে ধরে নাড়াচাড়া করতে করতে বললে—না, তোর কথাই সত্যি বীণা, কাজে আমি কাল যাইনি। গিয়েছিলাম আমার এক বন্ধুর কাছে।

এই বলে সে একটুখানি থামলো। বললে—পুরুষ বন্ধু।

বলেই সে আবার তেমনি ঘাড় বেঁকিয়ে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে—কে বল্‌ দেখি?

বীণা হেসে বললে—অলকবাবু।

তনিমা বললে—না। বলতে পারলিনে। কাল সেই চিঠি লিখে আবার তার পেছনে ছুটব ততো কাঙাল আমি নই।

বলে সে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। বললে—দেখলি? ট্যাক্সির ভাড়া দেওয়া হয়নি। ভুলেই গেছি।

বলে সে চাবি দিয়ে আলমারি খুলে দশটাকার একখানি নোট নিয়ে রাস্তার দিকের বারান্দায় গিয়ে রেলিংএর গায়ে ঝুঁকে পড়ে ডাকলে—সুন্দর সিং!

—মা-জী! বলে পাঞ্জাবী ড্রাইভার গাড়ির বাইরে এসে ওপরের দিকে তাকালো।

নোটখানা তনিমা তার হাতের ওপর ফেলে দিয়ে বললে—কত?

—সাড়ে আট রোপিয়া। বলে সে তার খাঁকি-রঙের পাৎলুনের পকেট থেকে চেঞ্জ বের করছিল, তনিমা বললে—থাক্‌, তুমি সন্ধ্যা ছটায় গাড়ি নিয়ে এসো।

সেখান থেকেই হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে সে বললে—বহুৎ আচ্ছা।

বীণার কাছে তনিমা একটি হেঁয়ালি।

গাড়ির ভাড়া দেয় সাড়ে আট টাকা, কোথায় যায়, কি করে—ভাল করে কিছুই জানবার উপায় নেই। তার কথাবার্তার কতক

বীণা বুঝতে পারে কতক-বা পারে না। কিন্তু তবু তাকে তার ভাল লাগে। মনে হয় দিনরাত তনিমার কাছে থাকলে সে যেন ভাল থাকে। তনিমা হাসলে, তনিমা ভাল করে কথা বললে, তনিমা সুখে থাকলেই বীণার সুখ।

তবু কেন যে তনিমা তার কাছ থেকে একটা দূরত্বের ব্যবধান টেনে দিনরাত ঘুরে বেড়ায়, কে জানে। এক একবার মনে হয়—এটা স্বাভাবিক। সে লেখাপড়া জানে না, ভাল করে কথা কইতে পারে না, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বন্ধু-বান্ধবের কাছে তনিমার বোধহয় লজ্জা হয়।

কিন্তু আশ্চর্য, তনিমার যত বন্ধু সবই পুরুষ, মেয়ে বন্ধু তার নেই বললেই হয়। কথাটা মনে হতেই বীণা জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা তনি, তোর যত বন্ধু সবই দেখি ব্যাটাছেলে, কেন বল্ তো?

তনিমা তার মুখের পানে তাকিয়ে একবার হাসলো। বললে—মেয়ের বন্ধু মেয়ে! দূর-দূর! সে আমার ভাল লাগে না। মেয়েরা বন্ধুত্ব করবে পুরুষের সঙ্গে, আর পুরুষরা করবে মেয়েদের সঙ্গে। তা নইলে বন্ধুত্বের নেশা যে দুদিনেই কেটে যায়।

বীণার নিজের কথাটা মনে হলো। মনে হলো তার সঙ্গে তনিমার বন্ধুত্বের নেশা ত তাহলে এতদিনে কেটে গেছে। বলতে তার লজ্জা হচ্ছিল, তবু সে জিজ্ঞাসা করলে—তাহলে আমার সঙ্গে তোর বন্ধুত্ব?

—বাস্ অমনি লেগেছে তোমার! বলে একটা স্নিগ্ধ হাসি হেসে তনিমা তার হাতখানি চেপে ধরে সস্নেহে তাকে কাছে টেনে আনলো। তারপর তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত চুপিচুপি বললে—তোকে কিন্তু আমি খুব ভালবাসি বীণা, তোর কথা আলাদা।

উত্তেজনার মুহূর্তে হঠাৎ আজ এতদিন পরে বীণাও তনিমাকে তার দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললে—আমারও তনিমা, সত্যি বলছি—আমারও···

কথাটা সে আর শেষ করতে পারলে না। ছল ছল চোখে তনিমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নিশ্চল মূর্তির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

তনিমা বললে—কাল রাতে ঘুমোইনি বীণা, বড় কষ্ট হচ্ছে এক্ষুনি আমি স্নান করে খেয়ে-দেয়ে একটুখানি ঘুমিয়ে নিয়ে কাজে বেরোব। তুই সকাল সকাল দাদাকে খাইয়ে নিজে খেয়ে নে। তারপর তুইও ঘুমোবি।

বীণা হাসলো। বললে—ঘুমোতে আমায় দিলে ত!

তনিমা তার আলমারি খুলে ফর্সা কাপড়-জামা বের করতে গিয়ে বললে—দাদা তোর ওপর খুব অত্যাচার করে, না?

বীণা ঘাড় নেড়ে একটু হেসে বললে—না।

তনিমা আর অপেক্ষা করলো না। বললে—একটু তাড়াতাড়ি রান্না করতে বল্ ভাই! বাজার এসেছে?

বলে সে স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকল। শোনা গেল, সে সেইখান থেকেই বলছে—বাজার কে আনলে বীণা? দাদা?

বীণা বললে—না। ঝি এনেছে।

—টাকা কোথায় পেলে?

—উনি দিয়েছেন। বললেন, তনিমার কাছে চেয়ে নিলেই হবে।

তনিমা ডাকল—বীণা, শোন্।

স্নানের ঘরের বন্ধ-দরজার বাইরে থেকে বীণা বললে—কি?

—ভেতরে আয় না! দরজা খোলাই আছে।

বীণা ভেতরে ঢুকলো। সাবান তেলের গন্ধে ঘরখানা ভুরভুর করছে। তনিমা হেসে বললে—ছোট বোনের কাছে বাজারের খরচটা চেয়ে নেবে। কেন? বর তোর রোজগার করতে পারে না? তুই পারিস না?

বীণা হেসে বললে—এইজন্যে ডাকলি?

—হ্যাঁ, তোর সঙ্গে এবার আমি ঝগড়া করব। তুই আমার বড় ভাজ, ঝগড়া করব না? আমি তোর ননদ, মনে থাকে যেন।

ঘাড় নেড়ে বীণা বললে—থাকবে।

—থাকবে কি রকম? ভারি যে কথা শিখেছিস দেখছি। দেবো এক্ষুনি গায়ে জল দিয়ে।

বলেই সে বীণার গায়ে-মুখে খানিকটা সাবান-গোলা জল ছিটিয়ে দিয়ে বললে—হলো ত?

মুখ ফিরিয়ে একটু সরে গিয়ে বীণা বললে—ইস্! একি করলি তনিমা? সকালে যে আমি একবার চান করেছি।

—না হয় আর একবার করলি। বলে তনিমা তার গায়ে আরও খানিকটা জল ছুঁড়ে কাপড় ভিজিয়ে দিলে। বললে—আয় দুজনে বেশ ভাল করে চান করি আয়। তুই আমায় সাবান মাখিয়ে দে, আমি তোকে মাখিয়ে দিই।

এইজন্যেই তনিমা তাকে ভেতরে ডেকেছিল বীণা বুঝতে পারলে। দুজনে বহুক্ষণ ধরে সাবান মাখামাখি করে মাথায় শ্যাম্পু দিখে, হেসে, গল্প করে, জল ছোঁড়াছুঁড়ি করে শুকনো কাপড়-জামা পরে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে যখন স্নানের ঘরের বাইরে এলো, তখন ঢং ঢং করে দশটা বাজলো ঘড়িতে।

তনিমা বীণার চুলে লোশন দিয়ে নিজের হাতে চুল আঁচড়ে দিলে। মুখে স্নো মাখিয়ে, সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে বললে—যা এবার। দেখিস্ আসতে দিলে হয়!

বীণাও নিচে যাবার জন্যে ছটফট করছিল। মুখ টিপে একটু হেসে বললে—যাই দেখি—স্নান করলো কিনা…

এই বলে সে চলে যেতে যেতে দরজার কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—তুই খেয়ে নে তনিমা, তোর কষ্ট হবে। আমি ওঁর খাওয়া হলে খাব।

তনিমা বললে—আচ্ছা, সে হবে, তুই যা ত আগে—দাদাকে স্নান করতে বল্!

কিন্তু সেই যে গণপতিকে স্নান করতে বলবার জন্যে বীণা নীচে গেল, সে আজও গেল কালও গেল। ঘড়িতে এগারোটা বাজলো, তবু আর ফেরে না।

বামুন-মা খাবার কথা জিজ্ঞাসা করতে এসে দেখলে, ইজিচেয়ারের ওপর অর্ধশায়িত অবস্থায় মাথার খোলা চুল মেলে দিয়ে তনিমা ঘুমিয়ে পড়েছে, তার মাথার ওপর বন্‌বন্‌ করে পাখা ঘুরছে।

ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে ডাকলে—মা।

এক ডাকে সাড়া মিললো না। বারকতক ডাকবার পর তনিমা চোখ মেলে জিজ্ঞাসা করলে—দাদা খেয়েছে?

বামুন-মা বললে—না মা, তিনি ত এইমাত্তর স্নান করতে গেলেন দেখলাম।

—বীণা কোথায়?

—নিচের ঘরে।

আড়চোখে ঘড়ি দেখলো তনিমা।

তারপর মুচকি হেসে আবার পাশ ফিরে চোখ বুজে পড়ে রইলো।

বামুন-মা জিজ্ঞাসা করলে—ওঁকে ডেকে দেবো মা?

ঘাড় নেড়ে তনিমা বললে—না।

গণপতিকে কাছে বসে খাওয়ালো বীণা। তার হাতে পান নিয়ে বীণা একবার বামুন-মার দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে—তনিমা বুঝি খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে?

বামুন-মা বললে—না মা, উনি ত এখনও খাননি।

বীণা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে, গণপতি হাঁকলে—ওগো শুনছো? তামাকটা অমনি সেজে দিয়ে গেলেই পারতে!

বীণার তখন কাঁদবার মত অবস্থা। ঘরের বাইরে এসে গণপতির মুখের দিকে তিরস্কারের ভঙ্গিতে তাকিয়ে বললে—ছিঃ, বললাম তখন আমি হাজারবার···তামাক তুমি নিজে সেজে নাওগে যাও, তনিমা এখনও খায়নি।

গণপতি বললে—তা বেশ ত। তামাকটা সাজতে আর কতক্ষণ?

—না, আমি পারব না যাও। বলে বীণা চলে যাচ্ছিলো।

গণপতি কট্‌মট্ করে তাকিয়ে বললে—হুঁম্।

গর্জন শুনে বীণা একবার পেছন ফিরতেই চোখের যে দৃষ্টির দিকে তার নজর পড়লো, সে দৃষ্টির অর্থ বড় জটিল। তাকে অমান্য করা বীণার সাধ্যাতীত। তাই সে তক্ষুনি ফিরে এসে বললে—নাও তোমাকেই ঠাণ্ডা করি আগে।

এই বলে সে তামাক সাজতে বসলো।

বীণা আর তনিমা দু'জনে খেতে বসেছে মুখোমুখি।

বীণা মুখ তুলতে পারছে না। হেঁটমুখে খেয়ে চলেছে।

হঠাৎ একসময় তাকিয়ে দেখে, তনিমা মুখ টিপে টিপে হাসছে।

বীণা জিজ্ঞাসা করলে, হাসছিস যে?

তনিমা বললে, বল্ কেন হাসছি!

বীণা বললে, আমার কি দোষ? তুইই তো আমাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিলি পাঠিয়ে।

—কেন হাসছি বুঝতে তাহলে পেরেছিস?

বীণাও এবার হাসলো। হেসে আবার তেমনি হেঁটমুখে খেতে লাগলো।

তনিমা বললে, এক-একবার মনে হয় তোর মত হই। কিন্তু পারি না। আমি একরকম, তুই একরকম। আচ্ছা বীণা, তোর কি মনে হয়? তোর মত আমিও কাউকে বিয়ে করে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করি!

বীণা বললে, হ্যাঁ ভাই, খুব ভাল হয় তাহ'লে!

তনিমা বললে, না ভাল বোধহয় হয় না। ছেলেবেলা থেকে আমার স্বভাবটা ভারি চঞ্চল। কিছুতেই এক জায়গায় মন বসাতে পারি না। আজ যাকে কাছে পাই, কাল সে পুরনো হয়ে যায়। আমার স্বামী যে হবে—সেরকম স্ত্রী সে চাইবে কেন? অবশ্য আমি যদি চাতুরী করতে চাই তো সারাজীবন চেষ্টা করলে স্বামী আমাকে ধরতে পারবে না। কিন্তু না, সেরকম জীবন আমি চাই না।

এই পর্যন্ত বলে তনিমা খেতে খেতে কি যেন ভাবতে লাগলো। নিজের মধ্যে যেন ডুবে গেল। আবার যখন কথা বললে খাওয়া তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বললে, নাঃ, আমার মত মেয়েকে কোনও পুরুষ বোধহয় বেশিদিন সহ্য করতে পারে না। তারা চায় তোর মত মেয়ে। যাকে তারা বিশ্বাস করতে পারে। যে শুধু একান্তভাবে তার স্বামী ছাড়া আর কাউকে চাইবে না, ভুলেও কারও দিকে মুখ তুলে তাকাবে না। বিচার করবে না, ভেবে দেখবে না, চিনতে চাইবে না, অন্ধের মত চিরজীবন শুধু সেই একজনকেই ভালবেসে যাবে। বিনিময়ে কিছু পাক্ আর নাই পাক্।

বীণা বললে, বা-রে, বিয়ে করেও মেয়েরা কি আর কাউকে ভালবাসতে পারে নাকি?

তনিমা হাসলো। বললে, পারে। পুরুষরা পারে, আর মেয়েরা পারে না?

বীণা বললে, না তনিমা, তুই একবার বিয়ে করে ছাখ্, দেখবি তখন—

কথাটা তাকে শেষ করতে দিলে না তনিমা। বললে দেখতে চাই না। তোকে আমি বোঝাতেও পারবো না।—খাওয়া হয়ে গেছে? ওঠ্।

খাওয়া শেষ করে দু'জনে বিছানায় গিয়ে বসলো।

হঠাৎ বীণার মাথার চুলে হাত পড়তেই, তনিমা দেখলে চুল তখনও শুকোয়নি। বীণার মাথায় যত চুল এত চুল সাধারণত খুব কম মেয়েরই দেখা যায়।

তনিমা বললে, মরবি যে! চুলগুলো শুকিয়ে নে। পাখাটা খুলে ওই ইজিচেয়ারটায় শুগে যা। আমি আর একটু ঘুমিয়ে নিই।

রাত জাগা ঘুম। সহজে ভাঙবার নয়।

বেলা তখন প্রায় সাড়ে-তিনটে বেজেছে। তনিমার মনে হলো তার কাঁচা ঘুম কে যেন জোর করে ভাঙিয়ে দিলে। চোখ চেয়ে দেখে শিয়রের কাছে বসে আছে অলকবাবু।

অলকবাবু বললে—বাপরে বাপ্। এত ঘুম কেন দিনেরবেলা? রাত জেগেছ বুঝি?

মুখে কিছু না বলে গায়ের কাপড়টা ভাল করে টেনে নিয়ে তনিমা ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে।

অলকবাবু জিজ্ঞাসা করলে—কেন? শেষরাতে বুঝি ডিউটি ছিল?

এতক্ষণে তনিমা কথা বললে—না।

—তবে?

—এম্‌নি।

—এম্‌নি মানে?

—জানি না। বলে তনিমা উঠে বসলো। বসেই জিজ্ঞাসা করলে—বীণা শুয়েছিল এখানে, কোথায় গেল সে?

তনিমার আগের কথাটার জবাব বোধহয় অলকবাবুকে আঘাত করেছিল। মুখ দেখে তা বুঝতে পারা যায়নি, কথা শুনে টের পাওয়া গেল। বললে—তোমার বাড়িতে কে কোথায় শুয়ে থাকবে তা আমি কি জানি।

অভিমানক্ষুব্ধ ব্যথিত কণ্ঠস্বর।

তনিমাও চুপ করে রইল না। বললে—থাক্। সেকথা তোমায় জিগ্যেস করিনি। বলছি, বীণা এখানে শুয়েছিল, তোমায় দেখে সে উঠে গেল, না তার আগেই সে উঠে গেছে।

বলে সে খাট থেকে নিচে নেমে মাথার খোলা চুলগুলো খোঁপার মত করে দুহাত দিয়ে জড়াতে-জড়াতে বাইরে যাবার জন্যে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

অলক বললে—ওকে তুমি দেখাতে চাও না আমাকে—লিখেছিলে না?

রুক্ষকণ্ঠে হ্যাঁ বলে তনিমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু ফিরে আসতেও দেরি হলো না। চোখে-মুখে জল দিয়ে তনিমা ফিরে এসে দেখে, অলক উঠে দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে।

তনিমা তার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে একটু হাসলো। বললে—বোসো। তোমার রাগের মাত্রা এত বাড়লো কেন বল ত।

কৃত্রিম গাম্ভীর্য বজায় রেখে অলক বললে—বিশ্বাসঘাতকের ওপর রাগ হওয়া স্বাভাবিক।

তনিমার মুখের হাসি তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল। ফিরে দাঁড়িয়ে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বললে—কী। আমি বিশ্বাসঘাতক? বলতে লজ্জা করে না?

অলক বললে—তবে কি বলতে চাও বিশ্বাসঘাতক আমি? আর সব মহামানব।

তনিমা বললে—নিশ্চয়। বীণাকে তুমি চাওনি? আমাকে ফাঁকি দেওয়া বুঝি সহজ?

অলক একটা সিগারেট ধরিয়ে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললে—আর একটু হলে তুমি ত আমায় ফাঁকি দিয়েছিলে তনিমা? পাগল কুমারটা তোমার কাছে—

কথাটা তনিমা তাকে শেষ করতে দিলে না। হাতজোড় করে তার কাছে এগিয়ে এসে বললে—থামুন মশাই, মেয়েদের সম্বন্ধে ওই রকম উঁচু ধারণাই আপনাদের চিরকাল। তা সে আপনার দোষ নয়, আপনাদের জাতের দোষ।

বলে সে একটু থামলো। বললে—তা নইলে দিব্যি হাসিখুশি মুখে তুমি কিনা সেদিন…বলব?

—বল না!

—যাও! তুমি আর কথা বোলো না। তবে আর বীণাকে আমার এত ভয় কেন? তুমি বললে কিনা—সুন্দরী নারীই হচ্ছে পুরুষের কামনার বস্তু। তা সে বীণাই হোক আর তুমিই হও।' মুখ দিয়ে কথাটা তোমার বেরোলো কি করে শুনি? ছি!

বলে তনিমা তার কাছ থেকে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে—অন্য মেয়ে হলে সেদিন থেকে তোমার সঙ্গে আর কথা বলতো না।

অলকের সুর একেবারে নরম হয়ে এলো। হেসে বললে—কি যে বল তুমি তনিমা।. হাসি-ঠাট্টা বোঝো না? কার সঙ্গে কার তুলনা! বীণা কি তোমার কাছে দাঁড়াতে পারে নাকি?

তনিমা বললে—তা না পারুক, এসব খোসামুদির কথা আমি ঢের শুনেছি। কিন্তু তুমি কুমারবাবুর কথা কি বলছিলে শুনি?

—বলছিলাম পাগলাটা ত আমাদের সঙ্গেই পড়তো, ওকে আমি অনেকদিন থেকেই চিনি। এককালে বড়লোক যখন ছিল, তখন এন্তার উড়িয়েছে, আজ আর একটি পাই পয়সাও নেই। ছাখো না কেমন

ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে ঘুরে বেড়ায়, দাড়ি-চুল কাটবার পয়সা পর্যন্ত জোটে না। তুমিও তো তাকে অনেকদিন থেকে চেনো, কিন্তু আগে আসতো না, এখন কেন আসে বুঝতে পেরেছ ?

তনিমা বললে—কেন আসে ?

অলক হাসল। বললে—তাও বুঝতে পার না? তোমার চাল-চলন দেখে ভেবেছে হয়ত তোমার অনেক পয়সা, একদিন ধার-টার কিছু চেয়ে বসবে।

তনিমাও হাসলো। বললে—পাগল! সেরকম লোক তিনি নন!

অলক একটুখানি বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বললে—লোকটির প্রতি যে তোমার অসীম শ্রদ্ধা দেখছি! এত ভক্তি ত ভাল নয়।

তনিমাও জবাব দিতে কসুর করলে না। বললে—ভাল হোক, মন্দ হোক, শ্রদ্ধার পাত্র যে তাকে শ্রদ্ধা করা উচিত।

অলক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—মেয়েদের শ্রদ্ধা বড় মারাত্মক তনিমা, তাই তো বড় ভয় করে।

তনিমা বললে—একজনকে শ্রদ্ধা করি বলেই যে আর-একজনকে ঘৃণা করব, একজনকে ভালো বলা যে আর-একজনের ভয়ের কারণ—সে কথা আজ আমি এই নতুন শুনলাম।

অলক বললে—তাহলে শ্রদ্ধা তুমি কর আর-একজনকে ? মানুষ বড় স্বার্থপর তনিমা, নিজের কথাটাই আগে জানতে চায়।

তনিমা হেসে উঠলো। বললে—বাজে কথা, নিঃস্বার্থপরতার অপবাদ পুরুষজাতকে কেউ দিতে পারবে না তা আমি জানি, কিন্তু আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি ভালবাসার উপর কিছু নির্ভর করে কি ? কাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করলাম, না ভালবাসলাম, না ঘৃণা করলাম, তাতে কার কি বয়ে গেল ?

—বয়ে যদি কারও যায় তনিমা ?

এই বলে অলক তার জবাবের অপেক্ষায় সকরুণ নয়নে তনিমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

তনিমাও তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—যায় নাকি ?

—নিশ্চয় যায়।

—মিথ্যা কথা।

অলক বললে—না, মিথ্যা কথা নয়।

তনিমা বললে—থামো ! তা যদি হ'তো তাহলে আজ পাঁচ দিন কেউ না এসে থাকতে পারতো না। চিঠি পাবার অপেক্ষা না করে মলো কি বাঁচলো সে খবরটাও অন্ততঃ একবার জানতে চাইতো।

দেখতে-দেখতে অলক একেবারে গলে জল হয়ে গেল। তক্ষুনি উঠে দাঁড়িয়ে তনিমার কাছে গিয়ে বললে—রাগ করেছ তনিমা ?

বলেই সে হাত বাড়িয়ে তনিমার হাতখানা ধরতে যাচ্ছিল কিন্তু তনিমার দৃষ্টি হঠাৎ সামনের দরজার দিকে পড়তেই সে যেন শিউরে কয়েক পা সরে গিয়ে তার সেই সন্ত্রস্ত মুখের ওপর জোর করে হাসি টেনে এনে বললে—আসুন, আসুন কুমারবাবু।

কুমার পা বাড়িয়ে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। টানা-টানা সুন্দর দু'টি চোখ, বিস্তৃত ললাট, সমুন্নত নাক, আজানুলম্বিত বাহু। একটু হেসে সে অলকবাবুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে—এই যে, ভালো তো ?

অলক মুখ তুলে একবার তাকালো। হুঁ বলে কেমন যেন অন্য-মনস্কভাবে অনিচ্ছাসহকারে একবার ঘাড় নেড়ে হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আবার আর একটা সিগারেট ধরাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কুমার তখনও দাঁড়িয়েছিল। তনিমা বললে—বসুন কুমারবাবু, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

কথাটা শুনবামাত্র অলক সিগারেটটা ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে

চোখের পাতা দুটি তুলে তনিমার দিকে একবার বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বললে—হ্যাঁ—বসুন।

ব্যাপারটা বোধহয় কুমার বুঝতে পারলে? তার চেয়েও বেশি বুঝলে তনিমা। কুমার বললে—থাক। বসবার জন্যে আসিনি। এসেছিলাম···শুনলাম কাল তুমি আমার খোঁজে···

সর্বনাশ!

কথাটা যাতে অলকের সামনে শেষ করতে না পারে তারজন্যেই বোধহয় তার হাতখানা ধরে ফেলে তনিমা তাকে ইজিচেয়ারের কাছে টেনে এনে বললে—বসুন। শুনব এরপর।

অলক উঠে দাঁড়ালো। দীর্ঘনিশ্বাসের পরিবর্তে এক-মুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে—আমি চললাম তনিমা, তোমাদের প্রাইভেট কথাবার্তা আমার সামনে হওয়া উচিত নয় বলেই মনে হচ্ছে।

তনিমা তার মুখের দিকে তীব্রদৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে বললে —বটে!

—তা নয় ত কী? বলে অলক পেছন ফিরে দ্রুতপায়ে দরজার কাছে গিয়ে বললে—চললাম।

বলেই সে আর অপেক্ষা না করে সিঁড়ির ওপর জুতোর শব্দ করতে করতে নিচে নেমে গেল।

তনিমা দরজার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কুমার গলাটা তার পরিস্কার করে ফের কি যেন বলবার জন্যে উদ্যত হতেই তনিমা ফিরে তার কাছে গিয়ে ম্লান একটু হেসে বললে—আপনারা বড় নিষ্ঠুর কুমারবাবু।

কথাটা কুমার ভাল করে বুঝতে পারলে না। বললে—কারা নিষ্ঠুর?

তনিমা বললে—এই পুরুষজাতটা।

কুমার হাসলো। বললে—হ্যাঁ, একটুখানি নিষ্ঠুর করেই বিধাতা আমাদের তৈরী করেছেন। তা নইলে নারীর নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে না পেরে পৃথিবী থেকে আমাদের বিদায় নিতে হতো।

তনিমা একটুখানি বিস্মিত হয়ে বললে—সে কি? আপনার মুখে এই কথা শুনব তা ত ভাবিনী।

কুমার বললে—কার মুখ থেকে কখন্ কি রকম কথা বেরোবে আগে থেকে তা ভেবে রাখলে বড় ঠকতে হয় তনিমা। যাক্, আমি শুনলাম কোন্ একটি মহিলা আমার খোঁজে গিয়েছিলেন। শুনে প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এমন কে মহিলা এলো—আমার খোঁজে··· তারপর অনেক ভেবেচিন্তে আবিস্কার করলাম যে বোধ হয় তুমিই। তুমি গিয়েছিলে নাকি? কি প্রয়োজন? হঠাৎ?

—হ্যাঁ আমি কাল সারারাত ধরে বাইরে রাস্তায় অপেক্ষা করেছিলাম তোমার সঙ্গে একটু কথা বলব বলে। কিন্তু···

—হঠাৎ তুমি?

তনিমা কোন উত্তর দিলে না।

কুমার এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি, এবারে তার মুখের পানে তাকিয়ে দেখলে চোখ দুটি তার ছল্ ছল্ করছে। বললে—একি তনিমা, তুমি কাঁদছ নাকি? তোমার চোখে ত জল কখনো দেখিনি।

তনিমা তার হাতের রুমাল দিয়ে চোখ দুটি একবার মুছে নিয়ে বললে—দেখেন নি? আপনার দৃষ্টিশক্তি তাহলে একটু ক্ষীণ বলতে হবে।

কুমার বললে—হয়ত তাই। কিন্তু ব্যাপার ত বিশেষ ভাল বলে বোধ হচ্ছে না তনিমা। কি হলো তোমার?

তনিমা তবুও কোন উত্তর দিলে না।

কিছুক্ষণ কেটে গেল।

তনিমা হঠাৎ কুমারের একখানি হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে কি যেন বলতে গেল। কিন্তু মুখে কোনও কথা ফুটল না।

কুমার অবাক। এম্‌নি করে তার হাত সে কোনদিন চেপে ধরেনি। আজ তনিমার মধ্যে যেন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছে। কুমার বললে—তনিমা, তোমার সবকিছুর মধ্যেই যেন একটা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা, আমার হাত চেপে ধরা··· কিন্তু তোমার মনের কথা ত কিছুই শুনতে পেলাম না।

তনিমা বললে—স্থির হয়ে বসুন আগে। কথা কি অম্‌নি যখন তখন বললেই হলো।

কুমার হাসলো, বললে—তা সত্যি, কথা যখন-তখন বলা নিশ্চয়ই যায় না, কিন্তু সেই কথা শোনবার লোক যখন হাতের কাছে পেয়েছ —তখন বল তোমার কথা। স্পষ্ট পরিস্কার করে বল—লজ্জা সংকোচ বা ভণিতা যদি করতে চাও, চোখে বড় বিশ্রী ঠেকবে।

তনিমা বললে—আপনাকে এনে বোধহয় আপনার অনেক ক্ষতি করে দিলাম ?

কুমার হাসলো। বললে—ক্ষতি ? ডেকে এনে ? কই, ডেকে ত তুমি আনেনি। আমি ত নিজেই এসেছি তোমার কাছে। আমার ইচ্ছে না থাকলে তুমি হাজার বার গেলেও আমি আসতাম না নিশ্চয়ই। পথে আসতে-আসতে সেই কথাই ভাবছিলাম।

—কি কথা ?

—মনে হচ্ছিল যে আসবার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। শুধু প্রস্তুত নয়, একেবারে উন্মুখ হয়ে ছিলাম। কেন এমন হয় বলতে পারো ? খবরটা পেয়েই তাই এলাম। তোমাকে তো অনেকদিন আগেই দেখেছি, কিন্তু এখন যে তোমাকে একবারটি দেখবার জন্যে মন আমার দিনরাত ছট্‌ফট্‌ করে।

এ-কথার জবাবে তনিমা বাইরের বারান্দার দিকে একবার তাকালো। একবার কুমারের মুখের পানে তার সেই স্বচ্ছ, সুগভীর আয়ত চোখ দুটি তুলে ধরলো। তারপর একেবারে যেন অকস্মাৎ নিজেকে হারিয়ে ফেলে তার সেই ব্যাগ্র ব্যাকুল দুটি হাত বাড়িয়ে কুমারের গলাটা বেষ্টন করে তারই বুকের ওপর মাথা রেখে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে!

কুমার বিস্মিত, হতবাক। এতটা সে আশা করেনি! মুহূর্তের জন্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে সে যেন অবাক হয়ে চুপ করে রইলো। তারপর সোজা হয়ে উঠে বসে তনিমার হাত দুটি সযত্নে তার কাঁধ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মুখখানা তুলে ধরে বললে—একি তনিমা? একি হলো তোমার।

তনিমার দুই গাল বেয়ে তখন অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়ছে, কথা বলবার শক্তি নেই। কিছু না বলে আবার সে হাত দুটি তুলে কুমারকে ধরতে যাচ্ছিল—কুমার সোফার ওপর একটুখানি সরে বসল। বললে—কি বলবার আছে বল তনিমা, আগে শুনি, তারপর—

—তুমি জান না?

—এমন বিশেষ কিছু নয়।

মাথাটা নীচু করে তনিমা বললে—আমি তোমাকে চাই!

কুমার একটু হাসলো। হাসি দেখে মনে হলো, জোরে হাসবার শক্তি তখন তার নেই। বলল—পাগল! আমি কি তোমার পাবার যোগ্য? ভুল করে দু'দিনের জন্যে চেয়ে শেষে অনুতাপ করবে, তার চেয়ে বেশ করে একবার ভেবে ছাখো।

তনিমা বললে—দেখেছি। দু'দিনের জন্যে নয়—তুমি আমাকে বিয়ে কর।

কুমার বললে—না, তা হয় না তনিমা।

—কেন, কেন হয় না?

—বিয়ে আমি করব না তনিমা। বিশেষত তোমাকে ত নয়ই। তোমাকে আমি চিনি।

এবারে তনিমা যেন আহত হয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলো। কুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—চেনো! তার মানে ?

কুমার বললে—মানে শুনতে চেয়ো না তনিমা, তাতে লাভ বিশেষ কিছু হবে না। কিছুদিন আগে যদি এমনি নির্জনে তুমি আমার কাছে এম্‌নি করে আত্মসমর্পণ করতে, তাহলে হয়ত সাধ্য ছিল না তোমাকে প্রত্যাখ্যান করি। কিন্তু আজ—

—কি হয়েছে আজ ?

—আজ আমি অনেক দেখে আর অনেক ঠকে তোমাদের বেশ ভাল করে চিনেছি।

—চিনেছ ?

—হ্যাঁ।

তনিমা হাসলো। অপূর্ব অদ্ভুত সে হাসি।

কুমার বললে—চেনা বড় শক্ত তা জানি। তবে দেখেশুনে খানিকটা চেনা অবশ্য যায়। যতটুকু চিনেছি—আমার পক্ষে ওইটুকুই যথেষ্ট।

তনিমা চুপ করে কি যেন ভাবলে। ভেবে বললে—মেয়েদের তুমি ঘৃণা কর ?

ঘাড় নেড়ে কুমার বললে—না। কিছুদিন করেছিলাম ঠিকই। তারপর দেখলাম তাও শক্ত। সুন্দরী নারী দেখলে এখনও কেমন যেন ভালবাসতে ইচ্ছে করে। এই ধর-না কেন—আমাকে দেখেও—

এই পর্যন্ত বলে সে তার কথা শেষ করলে না। হঠাৎ চুপ করে কি যেন ভেবে সে উঠে দাঁড়ালো। বললে—আজ আমি চললাম তনিমা। পারি ত আবার একদিন আসব। কিন্তু আমাকে পাবার আশা তুমি ছেড়ে দাও।

বলেই কুমার চলে যাচ্ছিল, তনিমা কিন্তু কিছুতেই যেতে দিলে না। হাত বাড়িয়ে তার হাতটা ধরে আবার তাকে টেনে এনে বসালে। বললে—ভয় নেই। আর আমি কিছু করব না। আমার কতকগুলো কথা আছে। আপনি শেষপর্যন্ত শুনে যান।

কুমার বললে—'তুমি' বলতে বলতে আমাকে হঠাৎ 'আপনি' বললে কেন জানি না। 'তুমি'ই বল।

—না।

—কেন?

—তুমি বলার অধিকার ত আপনি আমায় দিলেন না!

কুমার এতক্ষণ পরে তনিমার মুখের পানে আবার তাকালো। বললে—আচ্ছা তনিমা, দেহের সম্বন্ধ ছাড়া নারীর সঙ্গে পুরুষের আর কোনও সম্বন্ধ কি হবে না? কেন, তুমি ত ইচ্ছে করলে আমাকে তোমার হিতাকাঙ্খী বন্ধু ভাবতেও পার।

তনিমা মাথা নেড়ে বললে—পারব না!

কুমার গম্ভীরভাবে বললে—হুঁ। পারবে না তা জানি। পারবার মেয়ে তুমি নও।

—আমি কী?

কুমার বললে—তুমি যে কি তা ত তুমি নিজেই ভাল করে জানো তনিমা, আমার কাছ থেকে সে-কথা নাই-বা শুনলে!

—তবু শুনি। নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণা হয়ত ভুলও হতে পারে।

কুমার বললে— নিতান্তই শুনবে তাহলে?

—হ্যাঁ, শুনব।

—সত্য কিন্তু অপ্রিয়।

—তা হোক।

—প্রথম তোমার বাড়ী আমি যেদিন এসেছিলাম, সেদিন তোমাকে একটি কথা বলেছিলাম তোমার মনে আছে?

—আছে। আমাকে বিয়ে করতে বারণ করেছিলেন।

—কেন করেছিলাম জানো? তোমাকে প্রথম দেখেই আমার মনে হয়েছিল, যে-সব মেয়েদের আমরা গৃহলক্ষ্মী বলি, মা বলি, সে-মেয়ে তুমি নও। একজন পুরুষকে অবলম্বন করে কায়মনোবাক্যে তাকেই ভালবেসে তারই ছেলে-মেয়ের মা হয়ে সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে তুমি পার না। নিত্য নূতনের অনুরাগিনী তোমার মন; সে-মনকে এক জায়গায় বাঁধবার চেষ্টা তুমি করো না তনিমা।

তনিমা মাথা হেঁট করে নীরবে কি যেন ভাবতে লাগলো। অনেকক্ষণ ভাববার পর মুখ তুলে বললে—আচ্ছা, এমন ত হতে পারে—সত্যিকার মনের মানুষ যদি পাই তাকে নিয়েই……

কথাটা কুমার তাকে শেষ করতে দিলে না। বললে—সে বড় কঠিন সাধনা তনিমা, অনেকের পর একে এসে যে থামে, বুঝতে হবে তার চলার শক্তি তখন কমে এসেছে—সে যেন জোর করে থামা।

তনিমা বললে—তাহলে কি আপনি বলতে চান ভাগ্যে প্রথমে যে জুটবে, মেয়েরা জোর করে তাকেই ভালবাসবে?

কুমার বললে—ভালবাসার মানুষটি ত অমনি চট্ করে সবার ভাগ্যে জোটে না তনিমা। যতদিন না জোটে মেয়েরা কি ততদিন শুধু একহাত থেকে আর-এক হাত, আবার সে হাত থেকে অন্য হাত, এম্‌নি করে ক্রমাগত শুধু হস্তান্তরিতা হতে হতেই চলবে?

তনিমা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলে। তারপর বললে—মেয়েদের সতীত্ব কি শুধু তাদের দেহে?

কুমার এবার না হেসে থাকতে পারলে না। বললে—এইসব বড়-বড় কথা শুধু তোমারই জিজ্ঞাসা করা তনিমা, কিন্তু আমি দেখেছি, আমি জানি, স্বামীর সহধর্মিণী হবার জন্যে যারা জন্মেছে, সন্তানের জননী যারা, গৃহের শান্তিশৃঙ্খলা মাধুর্য আর কল্যাণের ভার

যাদের হাতে—এ প্রশ্ন তাদের মনে কোনদিনই জাগে না। সতীত্ব যে নারীর কত বড় সম্পদ, তার অস্তিত্ব যে কোথায়, দেহে না মনে, তা তারা বেশ ভাল করেই জানে। কাউকে জিজ্ঞাসা করে এ-প্রশ্নের মীমাংসা করবার প্রয়োজন তাদের হয় না।

তনিমাও হাসলো। বললে—কাদের কথা বলছেন আপনি? পুরুষের গায়ে গা ঠেক্‌লে যাদের সতীত্ব যায়, তাদের কথা?

কুমার বললে—উপহাসের কথা নয় তনিমা। আমারও একদিন সেই ধারণাই ছিল। অতটা অবশ্য কেউ করে না, তুমি তাদের চেনো না। বরং ঠিক তার উল্‌টো। ধর, আজ যদি আমি তোমায় বিয়ে করি, তাহলে দেখবো তুমিও ঠিক ওইরকম করছো। কোনো পুরুষের গায়ে গা ঠেকলে শিউরে উঠে দশ হাত সরে যাবে তুমিই—ওরা যাবে না।

তনিমা বললে—ও! সেইজন্যেই বুঝি আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেন?

কুমার বললে—হ্যাঁ, ভাল হয়ত তোমাকে আমার আজও যেমন লাগে, তখনও তেমনি লাগবে, কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করতে আমি পারব না। যাক্, সেকথা নয়, আমি বিয়ে করব না। বিয়ের বয়েস আমার পেরিয়ে গেছে।

এই বলে কিছুক্ষণ থেমে কুমার আবার বললে—কিন্তু তোমারই বা আজ হঠাৎ আমার ওপর—

তনিমা বললে—হঠাৎ নয়। সেদিন আপনার দরজায় সমস্ত রাত আমি অপেক্ষা করেছিলাম, কিন্তু কেন তা ত জিজ্ঞাসা করলেন না?

—না, অন্যায় কৌতূহল আমার নেই।

—হয়ত আমার এ দুর্বলতা আপনার কাছে কোনদিনই আমি প্রকাশ করতে পারতাম না, কিন্তু সেদিন বড় বিপদে পড়েই ছুটে গিয়েছিলাম আপনার কাছে।

—বিপদ ?

—হ্যাঁ, আপনি জানেন দাদার সংসার চালাবার ভার আমার ওপর। তাছাড়াও আমার আরও অন্য অতিরিক্ত খুচরো খরচ-পত্র আছে, যা চালাবার জন্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আমি জানতাম অলকবাবুর অনেক টাকা আছে। প্রচুর উপার্জন তাঁর। অসৎপথে কত টাকা উনি উড়িয়ে দেন মেয়েদের পেছনে। তাই পাঁচ হাজার টাকা আমি ওঁর কাছে ধার নিয়েছিলাম।

—পাঁচ হাজার টাকা! কুমার যেন বিস্মিত হয়।—কই একথা ত আগে কখনও বলোনি!

তনিমা বললে—অলকবাবুও চালাক লোক। তিনি আমার কাছ থেকে অঙ্গীকার আদায় করে নেন যে আমি তাঁকে বিয়ে করবো। আমি তখন রাজীও হয়েছিলাম, কারণ তখনও আপনাকে আমি দেখিনি। অলকবাবু আমাকে দিয়ে একটা হ্যাণ্ডনোট সই করিয়ে নিয়েছিলেন। কারণ আমি পাছে টাকা দিতে রাজী না হই, অথচ বিয়েও না করি, এই ভয় তাঁর ছিল।

কুমার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—তারপর ?

—তারপর তিনি সম্প্রতি আমাকে ভয় দেখাতে শুরু করেছেন। বলছেন, হয় টাকা দাও, না হয় আমাকে বিয়ে করো। বিয়ে না করলে তিনি হ্যাণ্ডনোটের টাকা আদায়ের জন্যে নালিশ করতেও পারেন বলেছেন। এইকথা শুনেই সেদিন রাত্রে আমি ছুটে গিয়েছিলাম আপনার কাছে—কারণ, অলকবাবুর চরিত্রের অনেকটাই আমি জানি।

—কিন্তু কেন তুমি এ কাজ করতে গেলে তনিমা ?

—না করে উপায় ছিল না। তাছাড়া আমার দাদার সংসার আছে। তাঁরও টাকার প্রয়োজন। আমার সামান্য চাকরীতে অত খরচ চলতে পারে না, বুঝতেই পারছেন।

কুমার কোন কথা বললে না।

কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে কি যেন ভাবলে। তারপর বললে—তাহলে কি করবে স্থির করেছ ?

—কিছু স্থির করতে না পেরেই তো গিয়েছিলাম আপনার কাছে।

কুমার ভাল করে তাকালো তনিমার মুখের দিকে। দেখলো তনিমার চোখে জল।

—তুমি কাঁদছো তনিমা ?

তনিমা কোনও উত্তর দিলে না। কুমারকে আবার একবার হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তার কোলের ওপর মাথা রেখে কাঁদতে লাগলো।

কুমার কোনও কথা বলতে পারলে না। তনিমার হাত এবং মাথা কোনটাই সে সরিয়ে দিতেও পারলে না।

একটা অভূতপূর্ব বিরাট সমস্যা তখন তাকে বিমূঢ় করে তুলেছে।

শহরের পথে তখন আলো জ্বলেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার বীণাদের ঘরের মধ্যেও এত বেশি ঘনিয়ে উঠেছে যে, সেখানেও আলো জ্বালার প্রয়োজন।

বেচারা বীণা !

দিনরাত এত বেশি সাবধান সতর্ক হয়ে থাকে, তবু যেন তার নির্যাতনের আর শেষ নেই।

নিচের তলায় কলতলার পাশে একখানি ঘর মাসিক তিরিশ টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়েছে। অমূল্য নামে একটি কমবয়েসী ছেলে আর তার বুড়ীমা থাকে। ছেলেটি কোথায় যেন চাকরি করে। সেই ছেলেটির সঙ্গে হঠাৎ সেদিন বীণার মুখোমুখি দেখা।

বীণা গিয়েছিল কলতলায় জল আনতে। অমূল্য যাচ্ছিল অফিসে।

ব্যাপারটা নজরে পড়লো গণপতির।

বাস্, সেইদিন থেকে গণপতির মনে শান্তি নেই। এই নিয়ে বীণাকে দিনরাত কথা শুনতে হচ্ছে। কিন্তু অমূল্য যে সে জাতের ছেলে নয় বীণা সেকথা বোঝাবে কেমন করে তার স্বামীকে।

দিনরাত গণপতি বাড়ীতে বসে থাকে।

সব সময় সে বীণাকে যতটা সম্ভব চোখে-চোখে রাখে। দু'দিন অন্তর সে একবার করে বাড়ীর বাইরে যায়—তাও আবার মিনিট কয়েকের জন্যে। বাড়ীর ঝি তামাক ভাল কিনতে পারে না তাই তাকে নিজে গিয়ে বাজার থেকে তামাক টিকে কিনে আনতে হয়। একেবারে দুদিনের মত তামাক কিনে আনে।

যাবার সময় বীণাকে কাছে ডেকে বলে—এই!

হেঁটমুখে বীণা তার কাছে এসে দাঁড়ায়।

গণপতি কোনদিন তার হাতে ধরে, কোনদিন বা মাথার চুল টেনে দিয়ে বলে—শুনছিস্? না—আমার কথাগুলো তোর কানে যায় না?

বীণা ঘাড় নেড়ে বলে—শুনছি।

গণপতি বলে—বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছি, ঘরে কেউ নেই, একা ঘর—বুঝলি ত?

বীণা ঘাড় নেড়ে বলে—হ্যাঁ।

—হাঁ কি রকম? হ্যাঁ মানে?

বীণা কী তার জবাব দেবে? চুপ করে থাকে।

গণপতি বলে—টেক্ কেয়ার! খুব সাবধান।

নীরবে ঘাড় নেড়ে বীণা তার সম্মতি জানায়। কথা বলতে তার ভয় করে।

গণপতি কিন্তু তাকে ছাড়ে না। একটা ঠেলা দিয়ে মুখখানা তার সোজা করে বলে—কেন, কথা কইতে জানো না? কথা কও বলছি। কথা কও!

সজল চোখ দুটি তুলে বীণা তার মুখের পানে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে

থাকে। দু-একবার ঢোঁক গিলে কথা বলবার চেষ্টাও যে করে না তা নয়, কিন্তু রুদ্ধকণ্ঠে সহজে তার কথা সরে না।

গণপতি কৃত্রিম রাগের ভান করে বলে—তবে এই আমি চললাম বাড়ী থেকে বেরিয়ে। আর ফিরব না, বলে দিচ্ছি।

বীণার মাথাটা ঝন্ করে ওঠে। যদি সত্যিই চলে যায়? অভিমান করে সত্যিই যদি আর না ফেরে? প্রাণপণ শক্তিতে ছুটে গিয়ে বীণা তার কাপড় ধরে টেনে আনে। কাঁদতে কাঁদতে বলে—যেয়ো না।

তার বেশি আর কিছু বলতে পারে না সে।

গণপতি হেসে ফেলে। বলে—তবে? হেঁ-হেঁ, সেই আমি ছাড়া গতি নেই। অমন্ মুখ-গোম্‌রা করে থেকো না বলছি। মুখে তোমার সে হাসি কই? হাসো। হাসো বলছি। এই নাও, তবে এই বসলাম। তোমার মুখে হাসি দেখে তবে উঠবো।

বলে গণপতি আবার তার সেই প্রাচীন তক্তাপোষের ওপর বসে পড়ে। বীণার হাত ধরে তাকে কাছে টেনে এনে বলে—মুখে তোমার হাসি না দেখে বাড়ী থেকে বেরোচ্ছি না বাবা। হাসো।

বীণার চোখের জল তখনও শুকোয়নি। তবু তাকে হাসতে হয়। তার সেই আরক্তিম সুচারু দুটি ঠোঁট ঈষৎ বিস্তৃত করে অতি সকরুণ একটুখানি হাসি হাসে। মুক্তোর মত শুভ্র সুবিন্যস্ত দন্ত-পঙ্‌ক্তি দেখা যায়। রক্তাভ গালে একটুখানি টোল পড়ে। তাই না দেখে গণপতি আর স্থির থাকতে পারে না। বীণাকে তার বুকের ওপর টেনে এনে বলে, বলি কি তোমায় সাধে। তোমাকে বড্ড ভালবাসি যে।

বীণার অতবড় দুঃখ নিমেষেই যেন অন্তর্হিত হয়ে যায়। চোখ দিয়ে দর্‌দর্ করে অশ্রু গড়ায়।

কাঁদতে-কাঁদতে সে গণপতির গলা জড়িয়ে ধরে বলে—বাসো? সত্যি ভালবাসো? সত্যি বলছো?

গণপতি ঘাড় নেড়ে বলে—ইয়েস্।

বলেই সে উঠে দাঁড়ায়। দরজার কাছে গিয়ে বলে—তামাক নিয়ে আসি। বাট্ ইউ টেক্ কেয়ার। আমি বড় ভীষণ লোক।

বীণা ঈষৎ থেমে বলে—না।

গণপতি দরজার কাছে আবার থম্‌কে দাঁড়ায়। বলে—না বললে যে? কি বুঝলে বল ত।

বীণা দিব্য সহজকণ্ঠে বলে—বুঝলাম, কলতলায় যেতে তুমি বারণ করেছ, ওদিক আর মাড়াব না।

—বেশ, বেশ, তাই ত বলি, তুমি বোঝ সব, তবু কেন—

বলতে বলতে খুশী হয়েই এতক্ষণ পরে তামাক কেনার জন্যে ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল।

এমনি করে দিনের পর দিন কাটে।

গণপতি কখনও রাগ করে, সন্দেহ করে, বেচারা বীণাকে বকেঝকে, অপমান করে, সাবধান করে একেবারে নাস্তানাবুদ করে তোলে, আবার তখনই হয়ত বীণার মুখখানি দেখে আর চুপ করে থাকতে পারে না। তাকে কাছে ডেকে আদর করে, সোহাগ করে তাকে হাসাবার চেষ্টা করে।

প্রথম দিন সেই যে সে বীণাকে কাঁদিয়েছিল, তারপর বোধহয় তনিমার ভয়েই আর বেশি হৈ চৈ সে করে না। কিন্তু আজকাল ধীরভাবে সে যে তীক্ষ্ণ চোখা-চোখা বাক্যবাণে তাকে বিদ্ধ করে তার জ্বালা বোধকরি আরও বেশি দুঃসহ।

তনিমার কথা মনে হয় বীণার। মনে হয় তনিমার কথা না শোনার জন্যেই তার আজ এত বিপত্তি। দোষ সে করেছে বই কি!

তনিমাই কি তার একটা কিছু উপায় বলে দিতে পারে না? কিন্তু

তনিমাকে সে একা পায় না আজকাল। হয় তার ঘরে অলকবাবু, না হয় কুমারবাবু থাকেন।

সেদিন হঠাৎ সকালে বের হবার সময় তনিমা তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে—কেমন আছিস্ ভাই? ক'দিন ধরে কাজে কিরকম ব্যস্ত হয়ে রয়েছি দেখতেই ত পাচ্ছিস। তারপর? দাদা আর গালাগালি করে না ত?

বীণা হেসে বললে—না।

—থাকো, তোমরা তুটিতে সুখে থাকো। ছেলে হবে, মেয়ে হবে, স্বামীকে নিয়ে সুখে সংসার পাতাবে, ছেলে-মেয়েরা তোকে মা বলে ডাকবে···

আনন্দে বীণার বুক ভরে ওঠে।

গণপতি সেদিন এক কাণ্ড করে বসলো।

তামাক ফুরোবার পর সেদিন সে তামাক কিনতে গিয়েছিল। পথে তাদের সেই ভাড়াটে ছোকরা অমূল্যর সঙ্গে দেখা। শীর্ণ কঙ্কালসার চেহারা, গায়ের রং ফর্সা, পরণে একখানা সেলাই-করা ছেঁড়া ময়লা কাপড়, গায়ে একটি সাবান-কাচা টুইলের সার্ট, বোতাম অভাবে বুকের কাছটা একটি সেফ্‌টিপিন দিয়ে আঁটা, পায়ে সস্তা স্যাণ্ডেল।

গণপতিকে দেখেই সে হেসে বললে—কেমন আছেন দাদা?

—হুঁ, বলে গণপতি একটু গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—শোনো। অমূল্য থম্‌কে দাঁড়ালো।

গণপতি বললে—ছাখো, বাড়ী তোমাদের ছেড়ে দিতে হবে।

অমূল্য যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লো।

একটা ডাক্তারখানায় সে সামান্য বেতনে চাকরী করে, তুমাসের মাইনে এখনও বাকি। ডাক্তারখানার যিনি মালিক তিনি কি একটা

কাজে দেশে চলে গেছেন। তার ওপর বাড়ী ছাড়ার এই সর্বনাশা হুকুম। অমূল্যর আকাশ থেকে পড়বারই কথা।

গণপতির দিকে চেয়ে দেখলে, তার চেহারার মধ্যে করুণার লেশমাত্র নেই।

কথা বলতে তার ভয় করছিল, তবু ভয়ে ভয়ে নিতান্ত সঙ্কুচিত হয়ে বললে—দেখুন, এ সময় বাজার বড় খারাপ দাদা! এ সময় যদি···দয়া করে··

গণপতির মুখের চেহারা আরও রুক্ষ হয়ে উঠল। বললে—আমি সব জানি।

এবারে অমূল্য যেন আশ্বস্ত হয়ে বললে—যদি সব জানেনই দাদা, তাহলে ত বুঝতেই পারছেন বাজারের অবস্থা। আমাদের কত্তাবাবু দেশে চলে গেছেন—

কথাটা তাকে শেষ করতে না দিয়েই গণপতি সেই পথের মাঝেই হুঙ্কার দিয়ে উঠলো—চোপ্ হারামজাদা পাজি—

বেচারা অমূল্য ত ভয়ে কাঠ!

রাস্তায় লোক জমে গিয়েছিল। গণপতি বললে—চালাকি আমার কাছে চল্‌বে না, তা জানিস্? আই স্যাল্ কিল্ ইউ!

বলেই সে হন্ হন্ করে বাড়ীর দিকে চলে গেল।

হাঁ করে অমূল্য সেই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলে।

চোখ দুটো তার জলে ভরে এলো। কোঁচার খুটে চোখ মুছে সে এক পা এক পা করে ডাক্তারখানার দিকে চললো।

চলতে লাগলো বটে, কিন্তু তার বুকের ভেতরটা যেন তোলপাড় করছিল। জীবনে সে কখনও কারো কাছে এ-রকম দুর্ব্যবহার পায়নি। গণপতিও এতকাল তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে এসেছে। আজ সে ওরকম করলে কেন কে জানে! মাথাটা কি তার খারাপ হয়ে গেছে?

ডাক্তারখানায় গিয়ে দেখলে কত্তাবাবু সেদিনও আসেননি।

বড়বাবুর কাছে টাকা চাইতে গিয়ে ধমক্ খেয়ে ফিরে এলো। কাজে সেদিন তার মন বসল না। খদ্দেরকে এক জিনিস দিতে আর-এক জিনিস দিয়ে সেদিন তার আর লাঞ্ছনার বাকি কিছু রইলো না। তার ওপর ক্রমাগত তার মনে হতে লাগল—গণপতির সেই উগ্রমূর্তি—পথের মাঝে সেই অপমান।

হঠাৎ একসময় তার মনে হলো, ডাক্তারখানায় বিষ পাওয়া যায়, সেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলে কেমন হয়! কিন্তু তখনি মনে পড়ল তার বুড়ো মায়ের কথা। মা থাকতে আত্মহত্যা সে করতে পারবে না। একমাত্র ছেলে হারিয়ে মার মনে যে ব্যথা বাজবে তা যেন সে অনুভব করে শিউরে উঠল।

সেদিন রাত্রে ডাক্তারখানা থেকে বাড়ী ফিরবার সময় সারা পথটাই সে তার মায়ের মৃত্যুকামনা করতে করতে বাড়ী ফিরল। মা আগে মরুক তারপর নিজে সে একেবারে স্বাধীন হয়ে প্রাণপণে নিজের অবস্থাটা একবার ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করবে। না পারে এই দুঃখ-দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনের ওপর শেষ যবনিকা টেনে দিতে তখন আর তার বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না। একফোঁটা চোখের জল ফেলবার লোক যার নেই তার আর মরতে দুঃখ কি।

অলক প্রথমে কিছুতেই রাজী হয়নি, শেষে অনেক কষ্টে তনিমা তাকে রাজী করিয়েছে।—আরও দু'দিনের সময়।

তনিমা বললে—দ্যাখো, বিয়ে আমাকে করতেই হবে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আরও দু'দিন সময় আমি চাই।

—এখনও সময়?

—হ্যাঁ। বলে ঘাড় নেড়ে সম্মতির অপেক্ষায় তনিমা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অলক বললে—আচ্ছা দিলাম সময়। কিন্তু এদিকে বিয়ের সব প্রস্তুত, সেকথা যেন মনে থাকে।

—থাকবে। বলে তনিমা ঘাড় নেড়ে একটু হেসে অলককে মোটরে চড়িয়ে দিয়ে নিতান্ত বিষণ্ণমুখে তার কাছে এসে দাঁড়াল।

—আমাদের কি আপনি তুলে দেবেন দিদিমণি?

ব্যাপারটা তনিমা ভাল বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কেন?

অমূল্য বললে—দাদাবাবু কাল আমাকে বলেছেন উঠে যেতে, আজ সকালে আবার এই নোটিশখানা—

বলে তার কাপড়ের ভেতর থেকে বের করে অতি সঙ্গোপনে ভাঁজ করা একখানি কাগজ সে তার হাতে দিয়ে বললে—পড়ে দেখুন।

তনিমা দেখলে হাতের লেখা গণপতির। আগাগোড়া ভুল ইংরাজীতে লেখা। তা ছাড়া নোটিশে সে অনেক কথাই লিখেছে। আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে উঠে যাবার জন্যে তোমাকে তিন দিনের বেশি সময় কিছুতেই দেওয়া হবে না, কারণ যে অপরাধ তুমি করেছ তাতে ঘাড়ে ধরে এক্ষুনি তোমাকে বের করে দেওয়াই ছিল আমার কর্তব্য, যাইহোক, তিন দিন পরেও যদি না যাও, তা'হলে জোর করে তোমাকে তুলে দিতে ত হবেই এমন কি তোমার অপরাধের জন্য কোর্টে মামলা রুজু করে দিতেও পারি। তাতে তোমার জেল অনিবার্য।

বেচারা অমূল্যর মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

ঘরে ঢুকে তনিমা ডাকল, দাদা!

গণপতি বোধহয় তামাক টানছিল, গড়গড়ার শব্দে প্রথমে শুনতে পায়নি। হাসতে হাসতে বীণা ঘর থেকে বের হয়ে এল এবং তার পেছনে দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে গণপতি বললে—কি!

—অমূল্যদের তুমি উঠে যেতে বলেছ?

গণপতি ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ। নোটিশ দিয়েছি।

উঠে যেতে বলার কারণ তনিমা জানে।—আহা বেচারা তাতেই যদি সুখী হয় ত হোক্!

কি আর করবে, কিছুক্ষণ ভেবে তনিমা মুখ ফিরিয়ে অমূল্যকে বোধহয় তাদের উঠে যাবার কথাটাই বলতে যাচ্ছিল, দেখলে অমূল্য চোখের জলটাকে বৃথাই গোপন করবার চেষ্টা করছে আর ডান হাতের আঙুলের একটি নখ দিয়ে দেওয়ালের একটুখানি চূণ ছাড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

তনিমার দয়া হলো। বললে—কলকাতায় বাড়ীর অভাব কি অমূল্য, তবে হ্যাঁ, যতদিন না পাও ততদিন থাকো আমাদের সঙ্গে। তোমার ওপর কেমন যেন মায়া বসে গেছে, ছাড়তেও কষ্ট হয়। তা আর কি করবে বল। তোমরা ত আর নিজে উঠে যাওনি, আমরাই তুলে দিচ্ছি।

এই বলে সে চলে যাচ্ছিল, অমূল্য তার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ প্রাণপণে একবার পরিষ্কার করে নিয়ে ডাকলে—শুনুন।

—আমায় ডাকছ? বলে তনিমা ফিরে দাঁড়াল।

অমূল্য বললে—আমাদের ত এখন যাওয়া হবে না।

তনিমা জিজ্ঞাসা করলে—কেন?

অমূল্য বললে—আমাদের দু' মাসের ভাড়া বাকি, তাছাড়া আমাদের ডাক্তারখানার মালিক—

এবার গণপতি তার ঘর থেকে চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে এসে

দাঁড়াল। বললে—শোন্ তনিমা শোন্! না যাবার ফন্দিটা ছাখ একবার। হেঁ-হেঁ বাবা আমি জানি না তুমি কেন যেতে চাচ্ছ না?—আর ওই ছাখ্। বলে আঙুল বাড়িয়ে ওদিকে দেয়ালের কাছে বীণাকে দেখিয়ে দিয়ে বললে—সেই থেকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ড্যাব্ ড্যাব্ করে তাকাচ্ছে। আমি কিছু বলিনি, বলি দেখি-না শেষপর্যন্ত।

কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখবার প্রয়োজন হলো না। কথাটা শুনেই বীণা সেখান থেকে ছুটে সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেল। ওই শীর্ণকায় নিতান্ত নিরীহ ছেলেটির চরিত্রে স্বামী যে তার কলঙ্ক লেপে দিয়েছে সেকথা এতক্ষণ তার মনেই ছিল না। অমূল্যকে এত ভাল করে অন্যদিন সে দেখেনি, আজ তার সেই অশ্রুসজল নিতান্ত অসহায় কাতর মুখখানি দেখে বীণার মনে কেমন যেন মমতা জেগেছিল, তাই সে অমন করে সবকিছু ভুলে গিয়ে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে তারই মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তনিমা বললে—কি যে বল দাদা। আচ্ছা দাঁড়াও, সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এসো ত অমূল্য, শোনো।

বলে গণপতির কাছ থেকে তাকে ওপরে ওঠবার সিঁড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে তনিমা চুপি-চুপি বললে—ভাড়া তোমাকে দিতে হবে না। যেখানে হোক একটি ঘর দেখে তোমরা উঠে যাও। কেমন?

জবাবে অমূল্যর মুখ দিয়ে আর কথা বের হলো না। আবার একটা ঢোক গিলে সে একবার তনিমার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে পাশের দরজা দিয়ে তাদের ঘরে চলে গেল।

তনিমা ওপরে উঠে গিয়ে দেখে বীণা তারই অপেক্ষায় দরজার পাশটিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তনিমা তার হাতে ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে বললে—বোস্, ক'দিন তোর সঙ্গে ভাল করে কথা কইতে পারিনি।

বলে সে সোফার ওপর নিজেও বসল। বললে—যাঃ কাঁটা

তোর দূর করে দিলাম। এবার আর সন্দেহ করবার কিছু থাকবে না, তোরা ছুই স্বামী-স্ত্রীতে খুব সুখে থাকবি।

কথাটার কিছুই সে বুঝতে পারলে না। তনিমাকে কয়েকদিন সে ভালো করে দেখিনি। আজ কাছে পেয়ে তাই সে তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল, বললে—কি ?

তনিমা হেসে বললে—তোর মাথা।

স্বামী-স্ত্রীতে সুখে থাকবার কথাটা মাত্র সে শুনেছিল। সেও একটু হেসে তনিমার হাতখানা চেপে ধরে বললে—কি বললি ? আমরা সুখে থাকব ? সে কি আমার অদৃষ্টে হবে ?

আজ আর তর্ক করে বুঝাবার মত মনের অবস্থা তনিমার ছিল না। তাই সে শুধু ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ হবে। অমূল্যদের যাবার সব ব্যবস্থা করে দিলাম। বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বীণার মুখের দিকে তাকিয়ে তনিমা বললে—ছু' একদিনের মধ্যেই এ পাপ তোদের কাছ থেকে বিদায় হয়ে যাবে।

কথাটা বীণা বিশ্বাস করলে না। বললে—যাঃ!

—যা নয় বীণা, সত্যি। আমি বিয়ে করব।

—সত্যি ? কাকে ? কবে ? সত্যি, না তোর মিছে কথা!

—সত্যি, আমি অলকবাবুকে বিয়ে করব। কেমন, ভালো বর হবে না ?

বীণা বললে—বেশ মানাবে। আমি ত তাই বলছিলাম যে বিয়ে কর—

তনিমা উত্তর না দিয়ে ঘরের মধ্যে ইতস্তত পায়চারী করতে লাগলো।

বীণা বললে—ছট্‌ফট্‌ করছিস কেন ? বোস্, ছুটো কথা বলি।

—কথা। হ্যাঁ, বল্। আমি একটা লোকের জন্য ছট্‌ফট্‌ করছি। দাঁড়া, দেখি এলো কিনা। লোকটার কি সময়েরও জ্ঞান নেই ?

—কে তনিমা ?

—কে আবার। বল্ ত কে?

বীণা বললে—কি জানি ভাই, তোর ত আর লোকের অভাব নেই। আচ্ছা তনিমা, তোর বেশ অভ্যেস হয়ে গেছে, না? ব্যাটা-ছেলেদের কাছে দাঁড়াতে তোর গা ছম্-ছম্ করে না?

তনিমা বললে- না। আচ্ছা, বামুনঠাকরুণ এসেছে? রান্না হচ্ছে ত!

—হ্যাঁ, হচ্ছে ত!

—যা ত ভাই, ওকে বলে আয় আজ রাত্রে কুমারবাবু খাবেন এখানে। বেশ ভাল করে রান্না-বান্না যেন করে। কিছু আনতে যদি হয় ত যেন টাকা নিয়ে যায় আমার কাছ থেকে।

বীণা গেল রান্নাঘরে। কিছুক্ষণ পরেই হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলো—কুমার।

তনিমা বললে—আসুন। আপনার না পাঁচটার পরেই আসবার কথা? আপনি আসবেন বলে আর একজনকে আসতে-না আসতেই বিদায় করলাম।

কুমার বললে—ভাল। আমার ওপর তোমার অনুগ্রহ তাহলে এখনও তেমনি প্রবল বলতে হবে। কিন্তু দু'দিন পরেই তোমার বিয়ে। নেহাৎ কথা দিয়েছিলাম তাই এলাম, নইলে—

তনিমা বললে—আসতে ভয় করে বুঝি?

ঘাড় নেড়ে কুমার বললে—হ্যাঁ, ঠিক তাই। যাক্—আজই হয়ত আমাদের শেষ দেখা।

তনিমা হেসে বললে—বেশ ত! তারজন্যে ত অনুতাপের কিছু নেই কুমারবাবু। বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

কুমার ধীরে ধীরে বসলো।

বললে—অনুতাপের ত কিছু নেই তনিমা, কিন্তু তুমি শেষে বিয়ে করবে? কিন্তু, বিয়ে করা বোধহয় তোমার জীবনে একটা মস্ত বড় ভুল হবে।

তনিমা বললে—এই নিয়ে ত সেদিন অনেক আলোচনা হয়ে গেছে, অনেক অপমান আপনি আমাকে করেছেন, আর না। আপনি বলে তাই রক্ষে, অন্য কেউ হলে তাও সহ্য করতাম না।

বলেই সে দরজার বাইরে বীণাকে দেখতে পেয়ে বললে—আয় না বীণা, অত লজ্জা কিসের ?

বাইরে থেকে ঘাড় নেড়ে কিছু না বলে বীণা বলে গেল।

তনিমা হেসে বললে—দাদা আমার বারণ করে দিয়েছে ওকে পরপুরুষের সামনে বেরোতে। তাই ও আর আপনাদের সামনে আসবে না।

কুমার বললে—ভাল।

—ভাল ? তার মানে ? বাপ্‌রে বাপ্, বিয়ের পর আমার ওপর যদি এই আদেশ হয় ত আমি আত্মহত্যা করব।

কুমার হাসলো। বললে—আদেশও হবে, তুমি আত্মহত্যাও করবে না।

—কি করব তাহলে ? স্বামীর সে আদেশ মেনে নেবো ?

মানতে পারবে না বলেই ত ভয়।

—অথচ আদেশ তিনি করবেন ?

—নিশ্চয় করবেন।

—কেন ?

কুমার একটু হেসে বললে—কেন করবেন জানতে চাও ? বিয়ের পর তুমি হবে তোমার স্বামীর সম্পত্তি। মানুষ চায় না যে তার সম্পত্তি চোরে চুরি করে নিক্, তাই সে তার সম্পত্তি আগলে রাখে।

তনিমা জিজ্ঞাসা করলে—আগ্‌লাবার ক্ষমতা যদি তার না থাকে ?

কুমার বললে—যাবে চুরি। যেদিন সে বুঝবে সত্যিই চুরি গেলে বুদ্ধিমান যদি হয় ত সে নিজে সেখান থেকে সার দাঁড়াবে, সম্পত্তির

ওপর আর কোনও দাবী দাওয়াই রাখবে না, আর নির্বোধ যদি হয় ত সে চোর এবং সম্পত্তি দুইএর ওপর রাগ করে অভিমান করে আজীবন জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে।

তনিমার ঠোঁটে একটুখানি নীরস নিষ্ঠুর শুষ্ক হাসি দেখা গেল। দাঁতে দাঁত চেপে বললে—তাই চাই আমি। জ্বলুক সে, জ্বলে-পুড়ে মরুক্।

কুমার বললে—আজ একথা বললে চলবে কেন তনিমা? একদিন ত নিজে থেকে ধরা দিয়ে নিজের বাঁধন নিজে কিনেছ।

তনিমা বললে—বেশ করেছি।

তনিমা দাঁত দিয়ে তার নীচেকার ঠোঁটের একটুখানি চেপে ধরে কি যেন ভাবলে। বললে—ভুল করেছি, না? আচ্ছা আমি ত ভুলের দাম দিতে চলেইছি, সেও দিক্। জানুক যে, কাগজ-কলমের চুক্তিতে আর সব বাঁধা যায়, মানুষের মন বাঁধা যায় না।

বলে সে উঠে দাঁড়ালো।

কুমারও হেঁটমুখে বসে কি যেন ভাবছিলো।

দুজনেই চুপ!

তনিমা ঘরের মধ্যে একবার খাটের কাছে, একবার জানলার কাছে, একবার আর্শীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। একবার বাইরে গেল, তারপর ভেতরে ঢুকে হাসতে হাসতে বললে—কি ভাবছেন?

—ভাবছি তোমার ওই মনটিকে এক জায়গায় বাঁধবার মত কোনও বস্তু এ পৃথিবীতে আছে কি না।

তনিমা বললে—তারপর? ভেবে কিছু কূল-কিনারা পেলেন?

কুমার বললে—না। এমনি আরও দু-তিনটি মনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার, কিন্তু সেখানেও যেমন ভেবে কিছু কূল-কিনারা পাইনি, এখানেও তেমনি কিছু পাচ্ছি না।

—পাবেন না। আর আপনার ভেবেই বা লাভ কি?

বলে খুব খানিকটা হেসে তনিমা তার কাছে এসে দাঁড়ালো।

কুমার মুখ তুলে তার মুখের দিকে তাকাতেই তনিমা তার পায়ের কাছে কার্পেটের ওপর বসে পড়ে নিতান্ত ছেলেমানুষের মত আবদারের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলে—আচ্ছা আপনি ঠিক আমার মত আরও মেয়ে দেখেছেন?

কুমার বললে—দেখেছি।

—ঠিক আমার মত?

—হ্যাঁ, ঠিক তোমার মত। এত সুন্দরী না হলেও, তোমার মত।

—আমি তাদের সকলের চেয়ে সুন্দরী?

কুমার নীরবে ঘাড় নাড়লে।

—তাদের কাছে আপনি খুব আঘাত পেয়েছেন।

কুমার বললে—হ্যাঁ, পুরুষকে আঘাত ছাড়া আর কিছু তারা দেয় না।

তনিমা কেমন যেন একটুখানি বিস্মিত হলো।—বললে, বলেন কি? তা ছাড়া আর কিছু কি তাদের দেবার নেই?

কুমার বললে—হয়ত আছে। কিন্তু তার সন্ধান তারা নিজেরাই সহজে পায় না। অন্তত ততদিন পায় না—যতদিন না তারা নিজেরা অন্যের কাছ থেকে কঠোর আঘাত পেয়ে চমকে ওঠে।

তনিমা কি ভাবলে। ভেবে বললে—আচ্ছা, তবে জেনে-শুনে আঘাত পাবার জন্যে আপনি আমার কাছে আসেন কেন শুনি?

—আঘাত পাবার জন্যে আসি না।

—তবে কিজন্যে আসেন?

—নিজেই বুঝি না।

—আচ্ছা সেকথা আপনাকে আমি বুঝিয়ে দেবো।

বলে আবার তনিমা উঠে দাঁড়ালো। হাসতে হাসতে বললে—স্ত্রী স্বামীর প্রপার্টি না কি বললেন? হ্যাঁ, সম্পত্তি। আপনি জানেন

কি, আমার যিনি স্বামী হতে চললেন, কোন্ চোরের হাত থেকে সবার আগে তাঁর সম্পত্তি তিনি আগ্লাতে চান ?

কুমার বললে—আজ তোমার কি হয়েছে বল ত তনিমা ? অমন করছ কেন ? কি-সব বলছ যা-তা ?

তনিমা বললে—যা-তা নয়। সে চোর—তুমি, তুমি, তুমি।

বলে তনিমা তার বাঁ-হাত দিয়ে আলোর সুইচটা নিবিয়ে ঘরটা প্রথমে অন্ধকার করে দিলে। তারপর ঠিক একেবারে উন্মাদিনীর মত কুমারের গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার দুটি সুকোমল সুদৃশ্য বাহু দিয়ে সজোরে তার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করে বলে উঠল—সেই চোরের হাতেই আমি আমার সর্বস্ব সমর্পণ করলাম। শক্তি থাকে, প্রত্যাখ্যান করে জন্মের মত চলে যাও, আর যেন এসো না।

তনিমার মত মেয়ের বাহুবন্ধনী থেকে নিজেকে মুক্ত করা বড় সহজ কথা নয়। তনিমারও ছিল সেই বিশ্বাস।

কিন্তু আশ্চর্য্য ক্ষমতা কুমারের।

কুমার তার হাত দুটি সরিয়ে দিয়ে প্রথমে বললে, অত উত্তেজিত হয়ো না তনিমা। আমার কথা শোনো।

কী তোমার কথা ?

অলককে বিয়ে তুমি কোর না।

তারপর ?

কুমার বললে, কিছুদিনের জন্যে পালাও তুমি এখান থেকে। মনে যদি শান্তি চাও সুখ চাও—বিয়ে কাউকে কোরো না।

তনিমা বললে, কেন ? কাউকে বিয়ে করে আমি কি একটি সুখের সংসার রচনা করতে পারি না ?

পারলে মন্দ হতো না। কিন্তু তুমি পারবে না।

—কেন পারবো না ?

কুমার বললে, যে মেয়েরা পারে সে-জাতের মেয়ে তুমি নও।

তনিমা বললে, তুমি আমাকে চেনো না তাহলে।

—খুব চিনি। তোমাকে চিনি বলেই এই কথা বলছি।

তনিমা বললে, বুঝেছি তুমি আমাকে ঘৃণা কর।

কুমার বললে, না বোঝোনি। আমি তোমাকে ঘৃণা করি না। তোমার আমি মঙ্গল চাই। তোমাকে আমি ভালবাসি।

—এই বুঝি ভালবাসা ?

কুমার বললে, দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ না হলে ভালবাসা হয় না বুঝি ?

—না, হয় না। তোমাদের ও-সব মন-ভোলানো কথা আমার অনেক জানা আছে।

এই বলে আবার সে কুমারকে জড়িয়ে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়েছিল, কুমার সরে গিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

তনিমাকে এত বড় অপমান আর কেউ করেছে বলে মনে হয় না। দলিতা ভূজঙ্গিনীর মত তনিমা গর্জাতে লাগলো।

ছোবল্ মারার আগেই কুমার বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত তনিমা উঠে গেল।

কুমার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে। তনিমা দাঁড়িয়ে রইলো চৌকাঠ ধরে নিশ্চল মূর্তির মত। তারপর জুতোর শব্দ যখন আর শোনা গেল না, তখন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার তার সেই পরিত্যক্ত শুভ্র বিছানার ওপর গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো।

বেচারা অমূল্য যে কি কষ্টে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে তা আমরা জানি।

মা তার কানে ভাল শুনতে পায় না। এক বললে এক শোনে।

যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অমূল্য তাকে কোনও কথাই শোনায়নি। শুধু মার কাছ থেকে তার অমতে বাবার সোনার আংটিটি চেয়ে নিয়ে সকালে উঠে সেটা বিক্রি করে দিয়ে কিছু টাকা সংগ্রহ করে এনেছিল।

বেলা দশটা নাগাদ হঠাৎ কোত্থেকে ঘুরে এসে বললে—মা, চল, একটা খুব ভাল বাড়ী পেয়েছি।

মা একেবারে অবাক হয়ে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর বললে—সে কি রে! বলা নেই, কওয়া নেই, চললাম কি রে?

অমূল্য বললে—হ্যাঁ, চল।

মার কেমন যেন সন্দেহ হলো। চুপিচুপি ছেলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কিছু কাণ্ড-ফাণ্ড করিসনি ত বাছা? বল্ তাহলে তনিমাকে শুধোই না হয়!

বিছানার বাণ্ডিলটা দড়ি দিয়ে বাঁধতে-বাঁধতে অমূল্য হাত নেড়ে মাকে তার বুঝিয়ে দিলে যে, না, কোনও কাণ্ডই সে করেনি যার জন্যে এমন করে চোরের মত পালিয়ে যেতে হবে। তনিমা তাদের যেতে বলেছে।

এতদিনের বাড়ী ছেড়ে যেতে মার মনে কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। বললে—তোর যা খুশী কর্ বাছা, তবু আমি একবার তনিমাকে শুনিয়ে আসি।

বলে সে ওপরে উঠে গিয়ে ছাখে, তনিমা তখনও ঘুমোচ্ছে।

দরজায় অনেক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে নিরাশ হয়ে নিচে নেমে গিয়ে ছেলেকে আবার জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে দেখে, ঘরের যৎসামান্য জিনিসপত্র ইতিমধ্যে সবই সে গাড়িতে তুলেছে।

মা জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ রে অমূল্য, ভাড়া সব চুকিয়ে দিয়েছিস ত?

—হ্যাঁ।

—কেমন করে দিলি? মাইনে ত এখনও—

বলেই হঠাৎ কাল্‌কের কথা মনে পড়তেই বললে—দেখি তোর হাতের আঙুলটা!

দেখলে আংটি নেই।

সোনা বলতে বাড়ীতে এই আংটিটি মাত্র সম্বল ছিল। এই অমূল্যের বাবার স্মৃতি বলে সে নিতান্ত দুঃখের দিনেও কোন প্রকারেই হাতছাড়া করেনি। আজ তাই কি না—

মার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো।

হায়-হায় করে চীৎকার করে সেইখানেই সে কাঁদবার উপক্রম করছিল, অমূল্য তার হাত ধরে একরকম জোর করেই তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে বললে—চালাও।

মার চোখ দিয়ে তখন ঝর্‌ঝর্‌ করে জল ঝরছে।

তাই-না দেখে অমূল্যরও চোখ দুটো জলে ভরে এলো।

সজল চোখে তার একখানা হাত ধরে বললে—চুপ কর মা!

মা তার হাতখানা রাগ করে সরিয়ে দিয়ে বললে—তুই আর কথা বলিস্‌নে হতভাগা, তুই এত মন্দ হয়েছিস? ছি! চারদিন উপোস করে পড়েছিলাম, তবু তোর বাবার ওই আংটিটি আমি হাত থেকে খুলিনি, আর তুই কিনা তোর বাবার ওই আংটিই ঘুচিয়ে এলি? এমন করে তাড়াতাড়ি বাড়ী ছাড়বার কি এমন তোর দরকার পড়লো শুনি? কোনো মাতাল বদমায়েস বন্ধুর পাল্লায় পড়েছিস? বুঝি?

মা তার এম্‌নি বকতে-বকতে চললো।

চলন্ত গাড়ির ওপর থেকে কোচম্যান হাঁকলো—কোথায় যেতে হবে বাবু?

চোখের জল মুছে অমূল্য বললে—হাতিবাগান।

ঝম্‌ ঝম্‌ করে ঘোড়ার গলার ঘুঙুর বাজিয়ে গাড়ি চলতে লাগল।

গণপতির শঙ্কা-সন্দেহের আর কোনও কারণ নেই।

বীণার মুখে তনিমার বিয়ের খবর সে পেয়েছে।

শুনে গণপতির আনন্দের আর সীমা নেই। তক্ষুনি গণপতি কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে একটা প্রীতি-উপহার লিখতে বসে গেছে।

কিন্তু সেটি যেন আর শেষই হয় না।

গণপতি তার গড়গড়ায় একটা টান দিয়ে বীণার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে,—এ কি সহজ কথা নাকি! আমি বলেই তাই এতটা লিখে ফেললাম, অন্য কেউ লিখুক দেখি! অনেকদিন প্র্যাক্‌টিশ নেই কিনা, তাই দেরি হচ্ছে।

বীণা বললে—তার চেয়ে তনিমাকে দেখিয়ে নিলেই ত পারো। চট্ করে হয়ে যাবে, তাই যাও।

গণপতির বোধ করি রাগ হলো। বললে—মাইরি আর-কি! তোমার কি ধারণা—তনিমা আমার চেয়ে বেশি বিদ্বান? নেভার মাইণ্ড্! হাজার হলেও তনিমা 'শী' আর আমি 'হি'—কতো তফাৎ! যাক্‌গে, পাখাটা নিয়ে এসো, বাতাস কর।

বলেই সে আবার মাথা গুঁজে লিখতে বসলো।

এক হাতে গড়গড়ার নল, এক হাতে পেন্সিল।

লেখা যখন শেষ হলো রাত তখন দশটা।

গণপতির চোখ মুখ দেখে মনে হলো, সে যেন যুদ্ধে জয় করেছে। হাসতে হাসতে বললে—বাস্, ফিনিস্! এইবার দেখাব তনিমাকে। কল্‌কেটা তুমি আর-একবার—

বীণা কল্‌কেয় আগুন দিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ফুঁ দিচ্ছিল।

আগুনের আভায় উজ্জ্বল তার সেই সুন্দর মুখখানির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে-তাকিয়ে গণপতি আর থাকতে পারলে না। হাত বাড়িয়ে বীণার কাপড় ধরে তাকে কাছে টেনে এনে বললে—থাক্, ও ধরে যাবে, অমনি বসিয়ে দাও।

বীণা হাসলো সলজ্জ ভঙ্গিতে।

তারপর কল্‌কেটি গড়গড়ার উপর বসিয়ে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বললে—কি?

—এসো।

বলেই তাকে কাছে টেনে এনে গণপতি বললে—এ কদিন তোমাকে আমি অনেক বকেছি। না? তোমার ভারি কষ্ট হয়েছে। না?

আনন্দে বীণার মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছিল না। কথার পরিবর্তে তার চোখ দুটি অশ্রুভরে টলমল করতে লাগলো। গণপতির পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে চোখ মুছে বীণা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু গণপতি তার আগেই তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে—তোমায় আমি খু-ব ভালবাসি বীণা।

বীণা বললে—আর আমার কিছু চাই না।

বলে সে তার পা দুটি জড়িয়ে ধরে বারে-বারে মাথাটা সেইখানেই ঠেকাতে লাগলো।

গণপতি বললে—কি লিখলাম শুনবে?

বীণা মুখ তুলে ফিক্ করে একটু হাসলো। বললে? আমি কি বুঝবো?

—তাও ত বটে। কিন্তু আমি ওতে তোমার কথা লিখেছি বীণা। এই দেখ—আই এণ্ড মাই ডিয়ার রাণী, হ্যাভিং গট্ নো মাণি, গিভিং ইউ দিস্ হানি!

কিন্তু আমার নাম ত বীণা, রাণী নয়।

গণপতি বললে, মানে হৃদয়ের রাণী আর-কি!

বীণা বললে—কিন্তু রাণীর ইংরাজীও কি রাণীই হয় নাকি?

গণপতি বললে—নিশ্চয়। রাজা রাণী কি পাল্টায়, সব জায়গাতেই এক! বলে গড়গড়ায় একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললে—যাই, তনিমাকে অবাক করে দিয়ে আসি।

বীণাও উঠে দাঁড়ালো। বললে—চল।

তনিমা মুখ ভার করে বসেছিল। সারাদিন সে আজ পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে। এতক্ষণ পরে জেগে উঠেছে।

কাগজখানা তার হাতের কাছে বাড়িয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে গণপতি বললে—ছাখ্!

তনিমা মনে মনে পড়তে লাগলো।

পড়তে-পড়তে তার মুখখানি একটু একটু করে হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অবশেষে এক সময় হো-হো করে হেসে উঠে বললে—কি হবে এটা?

গণপতি বললে—কি আবার হবে? কাল ওটা ছেপে বিয়েতে বিলোব।

তনিমা বললে—বেশ। কাল সকালেই আমি এটা ছাপিয়ে দেবো। চমৎকার হয়েছে। তুমি এমন সুন্দর কবিতা লিখতে পার, তা ত জানতাম না দাদা।

গর্বে আনন্দে বুক ফুলিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গণপতি বললে—পড়্ না ভাল করে—পড়েই ছাখ্ না একবার।

—বা, পড়লাম যে! বলে তনিমা আর-একবার জোরে-জোরে পড়তে লাগলো—

Marraige of my sister
With a physician mister,
I am happy and my sister is glad,
She will secure a beautiful lad,
We will be double-double,
I shall pull houble-bouble,
Rani will no longer be sad.

I shall laugh and I shall cough
and I will dance.
Tanima has got many friends
They will get no entrance.
They will be sorry, they will come no more,
They will break their heads on the door !

—চমৎকার দাদা।

গণপতি বললে—আরে শেষ পর্যন্ত পড় না—ওই যে জায়গাটা, having got no money--

—পড়েছি বলে কাগজখানা রেখে দিয়ে তনিমা বললে—এখন যাও। আমার কাজ আছে।

—যাচ্ছি বলে ঘাড় নেড়ে এই সুযোগে একটা কথা গণপতি তাকে জিজ্ঞাসা করে নিলে। বললে--বিয়ের পর তুই থাকবি কোথায়? এখানে না অলকবাবুর বাড়ীতে?

তনিমা মাথা নীচু করে বললে—যেখানেই থাকি দাদা, টাকা-কড়ি, খরচ-পত্রের জন্যে ভেবো না। যেখানেই থাকি, তোমাদের খরচ তোমরা পাবে।

গণপতিও সেইটেই জানতে চায়।

তনিমার সেদিন কি যে খেয়াল হলো কে জানে, বেলা তিনটের সময় থেকে সে তার ইচ্ছামত নিজের ভালো-ভালো গয়না-গাঁটি, কাপড়-জামা পরিয়ে চুল বেঁধে দিয়ে আলতা পরিয়ে বীণাকে সাজাতে লাগলো।

বীণা বললে— কি যে করিস্ ভাই, ক'দিন পরেই তোর বিয়ে, অথচ নিজে না সেজে আমাকে সাজাতে বসলি! আমার বিয়ে ত নয়!

তনিমা হাসলো। বললে—আমার এতেই রক্ষা নেই, তার ওপর সাজি যদি ত সবাই বিয়ে করতে চাইবে। সেই জন্যেই সাজলাম না।

বীণাও হাসলো। তনিমা তাকে কাপড়টা ভাল করে পরিয়ে দিয়ে আর্শীর কাছে টেনে নিয়ে গালটা টিপে দিয়ে বললে—দ্যাখ্ দেখি একবার তুই নিজের দিকে তাকিয়ে! ইচ্ছে করলে তুই—

কথাটা তাকে শেষ করতে না দিয়ে বীণা বললে—যাঃ!

তনিমাও তার কথাটা আর শেষ করলে না। হাসতে-হাসতে বললে—এইবার তোর হাতে এইটা দই-এর খুরি দিলেই মানায় ভালো। কি বল্? খুরি অনেকদিন খাসনি, না?

বীণা লজ্জিত হলো। বললে—মাটির খুরি আর আমি খাই না।

—আচ্ছা এইবার তাহলে আমি নিজে সাজি। বলে তনিমা দুই হাত দিয়ে সর্বপ্রথমে তার মাথার খোঁপাটা টেনে খুলে ফেলতেই ঘন সুগন্ধি কুঞ্চিত চুল তার সমস্ত পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়লো। তারপর আর্শীর সামনে দাঁড়িয়ে মাথাটা বেঁকিয়ে চিরুণী দিয়ে আঁচড়াতে-আঁচড়াতে বললে—বিয়ের কনে নিজের হাতে সাজগোজ করে চললো বিয়ে করতে! শুনেছিস্ কখনও?

বীণা বললে—আয় না, আমি সাজিয়ে দিই।

তনিমা বললে—তোর সাজানো আমার পছন্দ হবে না। তার চেয়ে যা তুই বরং দু'দণ্ড দেখিয়ে আয় নিচে, আমি যাচ্ছি।

বীণার ইচ্ছাসত্ত্বেও সে লজ্জায় যেতে পারছিল না। তনিমা জোর করে তাকে ঘর থেকে ঠেলে বের করে দিয়ে দরজায় খিল বন্ধ করে দিলে।

দরজার খিল তখনও সে খোলেনি, বন্ধ দরজায় কে যেন ধাক্কা মারছে।

ভেতর থেকে তনিমা বললে, কে?

—খোলো।

অলকের কণ্ঠস্বর।

সাজগোজ তখন তার হয়ে গেছে। দোর খুলে অলককে দেখেই তনিমা বলে উঠলো, ভালই হলো, তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম।

অলক ভাল করে চেপে বসলো। তনিমা কিন্তু বসলো না। বললে, বল তুমি কি জন্যে এসেছ।

অলক বললে, বোসো। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

তনিমা বললে, শুনি আগে তুমি কিজন্যে এসেছ।

অলক বললে, আমি বলতে এসেছি,—আমাদের বিয়ে হবে রেজেষ্ট্রি করে। পুরুত ডেকে বিয়ে আমাদের হবে না।

—ভাল। তারপর?

অলক বললে, তারপর আর কি? সেই কথা জানাতেই আমি এলাম। আর বিয়েটা হবে দিন-দশেক পরে।

তারপর? আর কিছু বলবার আছে?

অলক বললে, বিয়ের পর তুমি থাকবে আমার কাছে। এ-বাড়ীতে থাকবে তোমার দাদা আর বৌদিদি।

তনিমা এতক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করলে, আমি নার্সের কাজ করবো না?

—না।

—দাদা তো এক পয়সা রোজগার করে না, তাদের খরচ চলবে কেমন করে?

অলক বললে, আমি চালাবো।

—আমার জন্যে তুমি খরচ করবে?

—করবো।

তনিমা জানলার কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো। অলক বললে, কি ভাবছো তুমি? তোমার মুখে সে হাসি নেই, আনন্দ নেই, মুখখানি শুকিয়ে গেছে—কি ব্যাপার বল তো!

—ব্যাপার কিছুই নয়। এম্‌নিই।

অলক বললে, না এম্‌নি নয়। তুমি ভাবছো তোমার দাদা-বৌদিদির কথা। তুমি তো নির্বোধ নও, তবু এ-কাজ করতে গেলে কেন?

—কি কাজ?

—তোমার ওই দাদাটির বিয়ে দিতে গেলে কেন?

—আমার খুশী। আমার ইচ্ছে। আমি বিয়ে দিয়েছি, দায়িত্ব আমার। তুমি কেন ওদের বোঝা বইতে যাবে?

অলক বললে, আমার একটা কথা শুনবে?

—শুনবো। বল।

অলক বললে, তোমার দাদার একটি চাকরি আমি ঠিক করে দিতে পারি। গণপতি যদি সেই কাজটা করে আর তোমাদের বাড়ীর নীচের তলাটা যদি ভাড়া দিয়ে দেয় তাহ'লে নিজের খরচ ও নিজেই চালাতে পারবে।

এতক্ষণ পরে তনিমা অলকের পাশে এসে বসলো। অলক ভেবেছিল বুঝি গণপতির প্রস্তাবটা তার ভালই লেগেছে।

কিন্তু তনিমার কথা শুনে সে চম্‌কে উঠলো। তনিমা বললে, ত্যাখো, আমি ভেবে ঠিক করেছি,—বিয়ে আমি তোমাকে করবো না।

—বিয়ে করবে না?

—না।

—কি করবে তাহলে?

—কিছুই করবো না। যেমন চলছে তেমনি চলবে।

অলক বললে, বুঝেছি। কিন্তু তুমি কি অঙ্গীকার করেছে বোধহয় তোমার মনে আছে।

—আছে। খুব মনে আছে। পাঁচ হাজার টাকার জন্যে তুমি আমার নামে নালিশ করবে। তার জন্যে যে শাস্তি পেতে হয় আমি মাথা পেতে নেবো। এই আমার শেষ কথা। এই কথা বলবার জন্যে আমি তোমাকে খুঁজছিলাম। ভালই হলো আজ তুমি নিজেই এসে গেলে।

তনিমার মুখ থেকে এই কথা শুনবে অলক তা ভাবতেও পারেনি। অলকের মনে হলো—এ যেন তনিমার কথা নয়, কেউ তাকে শিখিয়ে দিয়েছে।

কে শেখাতে পারে?

হঠাৎ তার মনে হলো কুমারের কথা।

এ নিশ্চয়ই কুমার ছাড়া আর কেউ নয়।

অলকের জীবনে নারীঘটিত ব্যাপারের অন্ত নেই। বিধাতা তাকে রূপ দিয়েছেন, অর্থ দিয়েছেন—তার ওপর ডাক্তারী পাশ করে ডাক্তার হয়েছে সে।

খুব যে একজন কৃতী ডাক্তার—তা নয়।

কিন্তু যে বস্তু থাকলে অনেক অপদার্থকেও কৃতী বলে মনে হয়—অলকের সে সবই আছে।

কৃতিত্বের ভাণ করতেও সে জানে।

এবং সেই মিথ্যার মুখোস পরে অনেক নারীর সর্বনাশ করে শেষে অলক থমকে দাঁড়িয়েছিল তনিমার কাছে এসে। ভেবেছিল তনিমাকে বিয়ে করে সংসারী হবে।

তনিমাও তখন ক্লান্ত। তাই সে অলকের কাছে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে একটা অঙ্গীকারপত্র লিখে দিয়েছে।

ওদিকে কুমারবাবু মাঝখান থেকে দিলে—সবকিছু তছনছ করে।

উদ্দামযৌবনা রূপসী তনিমা হার মানে নি কোথাও।

সেও তখন থমকে দাঁড়িয়েছে কুমারের কাছে এসে।

যেখানে পরাজয়, সেইখানে সে আরও উদ্দাম। মুহূর্তেই তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল অলক। মনে হলো যেন কুমারকে পরাজিত করতে পারলেই সার্থক হয় তার জীবন-যৌবন।

অথচ চিরকৌমার্যব্রতধারী কুমার যেন অপরাজেয়।

সেই কুমারের পদপ্রান্তে তনিমা তার যথাসর্বস্ব সমর্পণ করবার জন্য প্রস্তুত।

অলক কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে চুপ করে বসে রইলো, তারপর হঠাৎ এক সময় তনিমার দিকে তাকিয়ে বললে, তুমি আমাকে এরকমভাবে অপমান করবে তা আমি ভাবতে পারিনি।

তনিমা অলকের কাছে এগিয়ে এসে তার হাত দুটো চেপে ধরলে।—তুমি আমাকে ভুল বুঝো না অলক, আমি তোমাকে অপমান করিনি, তোমার ওপর রাগ অভিমান কিচ্ছু করিনি।

—তাহলে বিয়ে তুমি করবে না বলছো কেন?

—হঠাৎ কেমন যেন আমার মনে হচ্ছে।

—কী মনে হচ্ছে?

—ঠিক বুঝিয়ে তোমাকে বলতে পারছি না।

অলক বললে, বেশ, তাহ'লে তোমাকে দুদিন সময় দিলাম, তুমি ভেবে ছাখো। তোমার মনকে বুঝাও।

সেই ভাল।

তনিমা তখন একা থাকতে চাচ্ছে। বললে, আজ তুমি যাও। আমি ভাল করে ভেবে দেখি।

ভাববার কিই-বা আছে।

অলক চলে যেতেই তনিমা নিজেকে নিয়ে পড়লো।

প্রথমে ভেবেছিল—মিথ্যাচার তো সে অনেকদিন ধরেই করছে,

কীই-বা ক্ষতি হয়েছে তাতে? ভাল সে কাউকে বাসেনি, অথচ ভালবাসার অভিনয় করেছে। বেশি বাড়াবাড়ি হবার আগেই সে কেটে পড়েছে সেখান থেকে।

তার মনকে শুধু স্পর্শ করেছে একটিমাত্র পুরুষ। সে আর কেউ নয়—সে হচ্ছে গিয়ে কুমার।

মনে হয়েছে যেন এই মানুষটিকে পেলে সে আর সবাইকে পরিত্যাগ করে একে নিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু কুমার নির্বিকার।

তখন ভেবেছে, থাক্ তবে দু'জনেই। একদিকে কুমার, একদিকে অলক। দু'জনের সঙ্গেই চালিয়ে যাবে সে তার লুকোচুরি খেলা।

কিন্তু আজ তার কী যে হলো—মনটা তার বেঁকে বসলো হঠাৎ।

যে খেলা সে এতদিন খেলে এসেছে, আজ যেন সে খেলা খেলতে তার মন চাইলো না। দু'জনের ভেতর একজনকে সরিয়ে ফেলতে হবে। কুমারকে সে পারবে না। সুতরাং অলককে সরিয়ে ফেলাই উচিত।

তাই সে অলককে জবাব দিয়ে ভাবলো, এইবার নিজে একবার যাবে কুমারের কাছে।

শেষ চেষ্টা করে দেখবে।

যেতে কিন্তু হলো না।

বিধাতা বুঝি সে ব্যবস্থাও করে রেখেছেন।

ঘণ্টাখানেক পরে কুমারবাবুর ড্রাইভার একটি চিঠি হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালো তনিমার কাছে।

তনিমা চিঠিখানি খুলে পড়লে।

চিঠির সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকার একখানি চেক।

কুমার চিঠিতে লিখেছে—

একটু দেরি হয়ে গেল, তবু আশাকরি এই টাকা তোমার কাজে লাগবে। এই চেকটি তোমার ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিয়ে তোমার একখানি চেক অলককে দিয়ে দাও। বিয়ে বন্ধ কর। ইতি—

কুমার।

—কোথায় তোমার বাবু?

জানলার পথে রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়ে ড্রাইভার বললে, ওই তো গাড়ীতে বসে আছেন।

—চল আমি যাচ্ছি।

তনিমা উঠে দাঁড়ালো। হাতে কুমারের চিঠি আর চেক। ড্রাইভার চলল আগে আগে।

গাড়ীর কাছে গিয়ে তনিমা বললে, নেমে এসো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

কুমার বললে, না, আমি আর নামবো না। আমি চিঠিতে যা লিখে দিয়েছি তাই কর।

ড্রাইভার একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল, তনিমা সেইদিকে একবার তাকিয়ে বললে, ড্রাইভারের সামনে কিছু বলা যায় না। তোমাকে একটিবার আসতেই হবে।

গাড়ী থেকে নেমে যাবার মানে সে জানে। তনিমা কি খেলা যে খেলতে চায় তাও তার অজানা নয়।

কুমার বললে, এসো তুমি গাড়ীতে উঠে এসো। যা বলবার এইখানে বল। আমার একটা খুব জরুরী কাজ আছে। সেইজন্যে আমি ড্রাইভারকে দিয়ে চেকটা পাঠিয়ে দিলাম, নিজে গেলাম না।

তনিমা বললে, সত্যি বলছো?

—হ্যাঁ, সত্যি বলছি।

তনিমা ড্রাইভারের দিকে তাকালো।

কুমার বললে, অনেক দূরে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের কথা সে শুনতেও পাচ্ছে না, এদিকে তাকাচ্ছে না। তুমি কি বলতে চাও বল।

তনিমা যখন বুঝতে পারলে কুমার নামবে না গাড়ী থেকে, তখন সে নিজেই উঠে বসলো গাড়ীতে। বললে, তোমাকে আজ আমি আমার মনের কথা খুলে বলছি শোনো। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি—তুমি কেন আমাকে পাঁচ হাজার টাকা পাঠালে?

—অলকের দেওয়া টাকা তাকে ফিরিয়ে দিতে।

তনিমা বললে, তারপর?

—তারপর তুমি কাউকে বিয়ে না করে স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করবে। কাউকে বিয়ে করে তুমি সুখী হতে পারবে না। যাকে বিয়ে করবে তাকেও সুখে রাখতে পারবে না।

তনিমা বললে, একমাত্র তোমাকে। তোমাকে বিয়ে করে আমি নিজেও সুখী হতে পারবো, তোমাকেও সুখে রাখতে পারবো। তোমার এই চেক্ পাবার আগেই অলকের সঙ্গে আমার বিয়ে আমি ভেঙ্গে দিয়েছি।

কুমার বললে, আমাকে পাবার আশা তুমি ছেড়ে দাও। তোমাকে বিয়ে আমি করবো না।

—কেন?

কুমার বললে, এখনও শুনতে চাও?

—হ্যাঁ, শুনতে চাই। বল।

কুমার বললে, কারণ ঘরের মেয়ে তুমি নও।

কথাটা ধক্ করে গিয়ে বাজলো তনিমার বুকে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তনিমা জিজ্ঞাসা করলে, এইটেই তোমার শেষ কথা?

—হ্যাঁ। এই আমার শেষ কথা।

তনিমা তার হাতের চেক্‌খানা দেখিয়ে বললে, তাহ'লে এই পাঁচ হাজার টাকা তুমি আমাকে দিলে কেন?

—অলকের টাকা অলককে ফিরিয়ে দেবে বলে।

তনিমা বললে, যার সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধই রইল না তার টাকা আমি নেবো কেন? নেবো কোন্ অধিকারে?

কুমার বললে, আমি তোমার মঙ্গল চাই। আমি তোমাকে ভালবাসি।

তনিমা বললে, যাক্ আর ভালবাসার কথা বোলো না।

কুমার বললে,—দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ না হলে বুঝি ভালবাসা হয় না? কিন্তু একটুখানি ভেবে ছাখো—তোমার ওই দেহ, ওই রূপ, ওই যৌবন—এ কতদিন থাকবে? আমি এখনও বলছি—

তনিমা বললে, যাক্ আর তোমাকে উপদেশ দিতে হবে না। তোমার মনের কথা আমি বুঝেছি। তোমার অহঙ্কার নিয়ে তুমি থাকো। আমার পথ আমি দেখে নেবো। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম—পুরুষ জাতটার সঙ্গে এমনি লুকোচুরি খেলা খেলেই আমি আমার জীবনটা কাটিয়ে দেবো। কিন্তু মানুষ বুঝি খারাপ হতে চাইলেও চিরদিন খারাপ হয়ে থাকতে পারে না। হঠাৎ আমার মনে হলো—আমি ভাল হব। একজনকে ভালবেসে একটি সুখের সংসার গড়ে তুলবো। কিন্তু তুমি তা হতে দিলে না। কাজেই আমিও তোমার এই ভালবাসার দান নিতে পারলাম না। এই নাও তোমার চেক্।

এই বলে কুমারের দেওয়া পাঁচ হাজার টাকার চেকটি কুমারের গায়ে ফেলে দিয়ে তনিমা গাড়ী থেকে নেমে চলে গেল। পেছন ফিরে একবার তাকিয়েও দেখলে না।

কুমার ডাকলে, হরিচরণ!

ড্রাইভারের নাম হরিচরণ।

হরিচরণ কাছে আসতেই কুমার বললে, চল।

গাড়ীখানা বেরিয়ে গেল।

অলক বিয়ে করেছে তনিমাকে।

অলকের সিগারেট খাওয়া অভ্যাস। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সে সিগারেট টানছে। বাইরে অপর্যাপ্ত জ্যোৎস্নার সঙ্গে শহরের পথে গ্যাসের আলো মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে।

গ্রীষ্মকালের রাত। মৃদুমন্দ বাতাস বয়ে চলেছে।

খাটের ওপর শুয়ে তনিমা কি একখানা বাংলা নভেল পড়ছিল। এক সময় মুখ তুলে বললে—ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে?

—সিগারেটটা শেষ করে নিই।

—কেন, এখানে বসে শেষ করা যায় না?

—সিগারেটের ধোঁয়া তোমার সহ্য হবে? দরকার কি? এই ত হয়ে গেল।

বলে জ্বলন্ত সিগারেটটা সে জানলার বাইরে ফেলে দিয়ে খাটের ওপর তার কাছে এসে বসলো।

তনিমা বললে—এ-সব তুমি বাড়াবাড়ি করছ না ত? কেন, সিগারেটের ধোঁয়া আমার অসহ্য হবে কেন? সিগারেট ত সিগারেট, সেই সুগন্ধি চুরুটগুলোও ত দিব্যি নিশ্চিন্তে কতদিন আমার কাছে বসে-বসে টেনেছ। মনে নেই? গন্ধ সহ্য করতে না পেরে কতদিন উঠে গেছি। তা কই, তখন তো তুমি গ্রাহ্যও করনি?

অলক বললে—তবে আর বলছি কি তনিমা, তখন আমি ত মানুষ ছিলাম না, ছিলাম জানোয়ার। তোমাকে ঠিক ভালো তখন আমি বাসতাম না বোধহয়। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে ঠিক জানোয়ারের মত তোমার পাশে-পাশে ঘুরে বেড়াতাম।

—অথচ হঠাৎ আমার মধ্যে কিই-বা এমন দেখলে, যার জন্যে তুমি

এমন করে বদলে গেলে বলতে পার? আমার কিন্তু ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। সত্যি বলছি, মাঝে-মাঝে মনে হয় তুমি অভিনয় করছ।

কথাটা বোধহয় অলককে আঘাত করলো। একটু ভেবে সে বললে—তোমার মধ্যে কি যে দেখলাম জানি না তনিমা, হয়ত কিছুই দেখেনি। কিন্তু বিয়ের পর প্রথম যখন তোমাকে আমি দেখলাম, তখন ভাবলাম, তুমি আমার, তুমি একান্তভাবেই আমার। তখন আমার কি মনে হলো জানো? মনে হলো ডুবতে ডুবতে যেন তোমাকে জড়িয়ে ধ'রে, তোমাকে আশ্রয় করে আমি তীরে উঠলাম।

তনিমা বললে—কিন্তু এও কি সম্ভব? যাকে তুমি বিয়ের আগের দিন পর্যন্ত সন্দেহ করেছ, ঘৃণা করেছ, অবিশ্বাস করেছ···সেই তাকেই তুমি হঠাৎ ভালবেসে ফেললে? তোমার সব মিছে কথা। বাপরে বাপ্ পুরুষ মানুষ, এত অভিনয় করতে জানে!

বলে তনিমা তার মুখের পানে তাকিয়ে অবিশ্বাসের হাসি হাসতে লাগলো।

অলক বললে—তুমি হাসছো তনিমা, হাসো। কিন্তু সত্যি বলছি—এ হাসির কথা নয়। তুমি বিশ্বাস কর।

তনিমা বললে—বিশ্বাস আমি করেছি। কিন্তু সেই তুমি না অন্য কেউ?

অলকের পিঠের ওপরে যেন কেউ চাবুক বসিয়ে দিলে। বেদনায় অস্থির হয়ে চুপ করে নীরবে শয্যাপ্রান্তে শুয়ে রইলো অলক।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর বালিশের ওপর থেকে বইখানা সরিয়ে দিয়ে তনিমা প্রথমে ধীরে-ধীরে অলকের কাছে এগিয়ে গেল। তারপর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—চুপ করে রইলে যে? রাগ করলে নাকি?

অলক মিথ্যা বললে। বললে—না, ঘুম পাচ্ছে।

তনিমা বললে—এই ত। এমনি তোমরা সব। ঘুম তোমার পায়নি তা আমি জানি, অথচ বলছ ঘুম পাচ্ছে! এসো, কথা কও।

অলক চোখ মেলে চাইলে। বললে—কি কথা বলব ?

তনিমা হেসে-হেসে তার ওপর ঢলে পড়লো। বললে—এই বুঝি তোমার ভালবাসার কথা হলো ?

অলক বললে—ছাখো তনিমা, তোমাকে শুধু আমার একটি অনুরোধ—আমার ভালবাসায় যদি তোমার কোনদিন অবিশ্বাস হয় ত সে-কথা আমাকে তুমি মুখ ফুটে বোলো না। আমাকে শুধু নীরবে ভালবাসতে দাও। এ আমার বেশ লাগছে।

তনিমা হাসল। বললে—তথাস্তু।

কিন্তু এই একটিমাত্র অতি তুচ্ছ অবিশ্বাসের কথায় অলকের বুকের ভেতরটায় সেদিন কোথায় কি কল বিগড়ে গেল কে জানে, অনেক রাত পর্যন্ত দু'জনে হাসিতে, গল্পে, কথায়-বার্তায় কাটিয়েও অলক তার মনের মধ্যে কেমন যেন একটা দারুণ অতৃপ্তি বোধ করতে লাগলো।

গল্প করতে-করতে তনিমার কথাগুলো হঠাৎ এক সময় জড়িয়ে এলো, চোখের পাতা দুটো ক্রমশঃ ভারি হয়ে বন্ধ হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই দেখতে-দেখতে সে ঘুমিয়ে পড়লো। অথচ অলকের চোখে সেদিন আর ঘুম এলো না। আলোর বেড্-সুইচটা টিপে সেইখান থেকেই নিবিয়ে দিলে। ঘর অন্ধকার। কিন্তু আকাশের অজস্র জ্যোৎস্না তখন বিছানার ওপর এসে পড়েছে। ঘরে আলো ছিল বলে এতক্ষণ কেউ তা টের পায়নি। সেই জ্যোৎস্নালোকিত শুভ্র শয্যায় তারই একান্ত সন্নিকটে পূর্ণবিকশিত ঘনসুগন্ধী ফুলের মত নবযৌবনসম্পনা অপরূপ রূপলাবণ্যবতী যে সৌন্দর্য-প্রতিমা অকাতরে ঘুমোচ্ছিল, তার সেই অম্লান প্রফুল্ল ঘুমন্ত মুখের পরে অলক তার নিদ্রাহীন দু'টো চোখের ব্যগ্র ব্যথিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ঘননিবিড় আনন্দের পরিবর্তে কেন যে অন্তঃকরণে একটি সুতীব্র বেদনা বোধ করতে লাগলো কে জানে মনে হলো এমনি করেই বিধাতা হয়ত

তাকে তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করাবেন। যাকে সে একদিন তার একান্ত ভোগের সামগ্রী বলেই কামনা করেছিল, যে তাকে চিরদিন অমানুষ পশু বলেই জানে, সে তার প্রেমের অর্ঘ্য অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করবে না ত কি!

করুক। তবু সে তাকে ভালবাসবে।

সুখ-দুঃখ মিলন-বিরহের দ্বন্দ্ব-দোলায় দুলতে-দুলতে এই নববিবাহিত দম্পতির সুদীর্ঘ একটি বৎসর কেটে গেছে।

পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাদের বিশেষ কিছুই পরিবর্তন হয়নি। অলকের চেহারা যেন আরও ভাল হয়েছে। তনিমার চেহারার ভালমন্দ কিছুই বোঝাবার জো নেই।

পরিবর্তন হয়েছে শুধু বীণার সংসারে। কিছুদিন হলো বীণার একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে হয়েছে। আর গণপতির একটি চাকরি করে দিয়েছে অমল। বীণার ছেলেটিকে দেখবার জন্যে তনিমা প্রায়ই সেখানে আসা-যাওয়া করে। সদ্যোজাত শিশুর তত্ত্বাবধানের জন্যে কয়েকদিন আগে তনিমাকে দু'তিন রাত্রি সেখানে কাটাতে হয়েছিল। তখন একটা লোক রেখে দেওয়া হয়েছে। তনিমা মাঝে মাঝে যায় বটে, তবে রাত্রে থাকে না।

কিন্তু হঠাৎ সেদিন একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

বিকেলে নিয়মিত তনিমা যেমন রোজ বেরিয়ে যায়, সেদিনও তেমনি বেরিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারখানা থেকে সেদিন রাত্রে বাড়ী ফিরে অলক শুনলো তনিমা নেই। চাকর বললে—মা একটা চিঠি লিখে লোক পাঠিয়েছে ও বাড়ী থেকে।

চিঠিখানা খুলে অলক দেখলে তনিমার চিঠি। লিখেছে—

প্রিয়তম, খোকার অসুখ। আজ আর আমার ও-বাড়ী যাওয়া হবে না। কিছু মনে করো না লক্ষ্মীটি। আমি না দেখলে ওদের আর

কে দেখবে বল। অসুখ তেমন বাড়াবাড়ি কিছু নয়। হলে তোমায় আসতে লিখতাম। আজকের রাতটি কোনরকমে চোখ বুজে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দাও। কাল সকালেই আমি আসবো। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আমাকে থাকতে হলো। ক্ষমা করো। ইতি—তনিমা

তনিমার চিঠি।

একসঙ্গে থাকে বলে চিঠি লেখালেখি তাদের একরকম হয় না বললেই হয়। অথচ চিঠি লেখার একটা মাধুর্য আছে। সাদা কাগজের ওপর মনের কথাগুলি কালির অক্ষরে লিখে আর একজনের কাছে পাঠানোর আনন্দ অলক পায়নি। আজ এই প্রথম প্রিয়তমার ছোট্ট চিঠি পেয়ে সে সাগ্রহে সেটা বারে-বারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো।

একটি রাত্রের মাত্র এতটুকু বিরহ। খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমিয়ে রাতটা কোন্‌দিক দিয়ে যে পার হয়ে যাবে তা সে বুঝতেই পারবে না। পরদিন সকালে উঠে দেখবে তনিমা এসেছে।

কতটুকুই-বা সময়। তবু তার কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা মনে হতে লাগলো। মোজা খুলতে গিয়ে পা উঠলো না। চাকর চা নিয়ে এলো। তনিমার পরিবর্তে চাকরের হাতে চা। তবু তাকে খেতে হলো। কোন রকমে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে রাতের মতো ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম ভাঙলো পরদিন ভোর ছ'টায়।

চাকর এসে জিজ্ঞাসা করলে—চা আনবো?

ঠাকুর বললে—বাজারের খরচ—

অলক বললে—কত করে হয়?

—আজ্ঞে তিন টাকা।

কিন্তু টাকাকড়ি তনিমা কোথায় রেখে গেছে অলক তা খুঁজে পেলে না।

হাত-খরচের টাকা আয়রণচেষ্টে থাকবে না নিশ্চয়ই। আর তার চাবিই-বা কোথায়? অলক একবার এদিক-ওদিক হাতড়ে দেখলে, চাবির সন্ধান কোথাও মিললো না। নিজের পকেট থেকে টাকা তিনটি দিয়ে বললে, গাড়ীটা বের করতে বল্।

চাকর বললে—চা তৈরি···

অলক বললে—থাক্, চা আর করতে হবে না।

অলক ভাবলে আজ গণপতির ওখানেই চা খেয়ে আসা যাবে। নিশ্চয়ই বীণা খুব খুশী হবে। তারপর তনিমাকে নিয়েই ফিরে আসবে।

তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে গাড়িতে উঠে ষ্টার্ট দিয়ে অলক বেরিয়ে গেল।

গণপতির বাড়ীর সামনে গিয়ে দূর থেকে দেখলে দরজায় একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। অলকের আনন্দের আর সীমা রইলো না। ভাবলে, ভারি একটা মজা করা যাক্! ট্যাক্সিখানা বিদায় করে দিয়ে তার জায়গায় নিজে সে ট্যাক্সি ড্রাইভারের মত নিজের গাড়িখানা নিয়ে দরজায় অপেক্ষা করবে। এই ভেবে ধীরে-ধীরে গাড়িখানা রেখে যেমন মাটিতে পা দিয়েছে, দেখলে সদর দরজা খুলে বের হলো তনিমা আর তারই হাতে হাত রেখে একেবারে তার বাঁ দিকে কুমার!

ম্লান একটু হেসে কুমারের দিকে তাকিয়ে তনিমা বললে—কি আর করব বল—তাহলে যাই।

জবাব দিতে গিয়ে হঠাৎ কুমারের চোখে পড়লো অলকের দিকে। বিদায়ের অভিনন্দন দূরে থাক্, কোনও কথাই তার মুখ দিয়ে বের হলো না।

কিন্তু বলিহারী তনিমা! কুমারের মুখ-চোখের অবস্থা দেখেই পেছনে যে তার কি কাণ্ড হয়ে গেছে সুচতুরা তনিমা যেন তা ঠিক অন্তর্যামীর মতই টের পেলে।

কথার ধারাটাকে তক্ষুনি সে এমন তৎপরতার সঙ্গে পাল্‌টে নিলে যে তা একটা দেখবার মত বস্তু।

এতটুকুও বিচলিত হলো না তনিমা। পেছন ফিরে একবার তাকাবারও প্রয়োজন অনুভব করলে না। বরং সে তার একটি হাতের পরিবর্তে দুটি হাত দিয়ে কুমারের হাত ধরে অনুরোধের ভঙ্গিতে বললে— ভাগ্যিস্ আজ সকালে আপনার দেখা পেলাম! তা এই আপনার দু'টি হাতে ধরে বলে যাচ্ছি কুমারবাবু, আজকাল আমি আমার নিজের সংসার নিয়েই চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকি, এখানে আসবার সময় করে উঠতে পারি না। অথচ আমার দাদা-বৌদি নিতান্ত অসহায়—আপনি যেন মাঝে-মাঝে অন্তত একবার করেও এদের খবর নেবেন। আচ্ছা, আমি তাহলে—এক্সকিউজ মি—আমি বাড়ী না গেলে আবার ওঁর চা খাওয়া হবে না।

বলে পেছন ফিরে যেন ট্যাক্সির দিকে এগোতে গিয়েই মুখ তুলে অলককে দেখে বলে উঠলো—আরে, বেশ লোক ত তুমি। ঘুম থেকে উঠেই বুঝি···ছি ছি, চা-ও খাওনি ত? বাবা, তোমায় নিয়ে আর পারলাম না। আমার একটু দেরি হয়ে গেছে. আর অমনি ছুটে এসেছ?

বলেই নিজের হাতে অলকের গাড়ির দরজা খুলে বসে তনিমা বললে—নাও, শীগ্‌গির চালাও দেখতে পেলে বলবে—ছাখো এলো না। চল।

অলক গাড়ি চালিয়ে দিল। কুমার তার আগেই ট্যাক্সি করে চলে গেছে।

কিছুদূর গিয়ে তনিমা বললে—রাগ করেছ ত? বেশ। এবারে আমার মরণটা হলে বাঁচি।

ব্যথিত কণ্ঠে অলক বললে—রাগ করব না?

—না। করবে কেন? কষ্ট কি তোমার একার হয়েছে? আমার হয়নি? কি করব বল, ছেলেটার অমন অসুখ দেখে ত আর আসতে পারি না?

অলক গম্ভীর মুখে ষ্টিয়ারিং ধরে রইল, কোন জবাব দিলে না।

তনিমা একটু পরে বললে—এত রাগ? বেশ বাপু বেশ, আর আমি এখানে আসব না। ওরা মরুক আর বাঁচুক, আমার আর দেখবার দরকার নেই।

কতটুকুই-বা পথ। কথা কইবার সুযোগ আর হলো না। বাড়ী এসে গেল। দু'জনে গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে ঢুকল। বাড়ী ঢুকেই তনিমা চাকরকে জিজ্ঞাসা করলে—বাবু চা খেয়ে বেরিয়েছিল?

—না মা-জী!

—কেন? কেন, চা তৈরি করে এনে দিলিনে?

—বাবু যে বারণ করলেন মা-জী!

—বারণ তুই শুনলি কেন হতভাগা?

অলক বললে—ওকে বকছো কেন? আমিই বারণ করেছিলাম।

—কেন বারণ করলে? জান না, সকালে উঠে চা না খেলে তোমার মেজাজ খারাপ হয়ে থাকে।

—হাত-মুখ ধুয়েছ ত? না তাও না?

—তা ধুয়েছি।

তনিমা চা আনতে বলে অলকের পাশে বসলো। তার রুক্ষ চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—রাত্রে ঘুমিয়েছিলে ত?

—হ্যাঁ, রাত দুটোর পর।

তনিমা যেন আতঙ্কে চমকে উঠে বললে—দ্যাখো ত! ছি! হ্যাগা, আমার কি একদণ্ড কোথাও যাবার জো নেই?

অলক তার মাথাটা কাৎ করে তনিমার গায়ের ওপর দেহভার এলিয়ে নিতান্ত বালকের মত আব্দারের ভঙ্গিতে বললে—না, না তনিমা, আমাকে ছেড়ে—বল তুমি—জীবনে আর কোথাও—

কোথায় তার ব্যথা, তনিমা তা জানে। মাথাটা তার সযত্নে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে আদর করে বললে—না, আর যাবনা। হলো ত?

রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। সকাল-সকাল স্নান করে খেয়ে নিয়ে আজ আর দুপুরে কোথাও বেরিয়ো না লক্ষ্মীটি। ঘুমোও। একেবারে সেই বিকালে বেরোবে, কেমন ?

চাকর চায়ের ট্রে নামিয়ে দিলে। তনিমা বললে—ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে। আমিও ঘুমোব।

—কেন, রাত্রে তোমার ভাল ঘুম হয়নি ?

—কেন হবে না ? আমার আর কি, যত কষ্ট তোমার।

এমনি করে নানা কথাবার্তায় চা খাওয়া শেষ হলো।

অলক সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর কোথাও বের হলো না। দুপুরে সে অন্যদিন একটুখানি বিশ্রাম করেই বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। সেদিন সে তনিমার আদেশ মত খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় এসে বসলো। কলকাতা শহরে তখন একটু শীত পড়েছে। আলমারি খুলে অলকের জন্যে ভাল দামী একখানি শাল বের করে দিয়ে তনিমা বলেলে—বোসো, আমি খেয়ে আসি।

বলেই আবার কি মনে হলো দরজার কাছ থেকে হাসতে-হাসতে ফিরে এসে বললে—দেখলে, আমি কিরকম স্বার্থপর। তুমি শুয়ে পড়। ঘুম যদি পায় ত ঘুমিয়ো। জোর করে আমার জন্যে জেগে থাকবার কোনও দরকার নেই।

এই বলে শালখানির ভাঁজ খুলে অলকের গায়ের ওপর জড়িয়ে দিয়ে চলে গেল।

ফিরে এসে দেখলে, স্বামী তার তখনও ঘুমোয়নি, শালখানি গায়ে দিয়ে ঠিক যেমনটি দেখে গিয়েছিল, তখনও ঠিক তেমনি করেই বসে আছে।

তনিমা জিজ্ঞাসা করলে—ঘুমোও নি ?

অলক বললে—না, ঘুম আসছে না।

সকাল থেকেই অলকের মনে যে দুশ্চিন্তার ছায়া ঘন হয়ে উঠছিল, বিকেলে ঘুম থেকে উঠে তনিমা দেখলে তা অপসারিত হয়ে গেছে। অলক আবার ঠিক আগের মত হাসছে, কথা বলছে, ভালবাসছে।

সাহেবী-পোষাক পরে চা খেয়ে অলক ডাক্তারখানায় বের হয়ে গেল। যাবার সময় তনিমাকে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি যাবে না ?

তনিমা ঊর্ধদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কি যে ভাবলে কে জানে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—না। আজ থেকে আমি নিজেকে এইখানে বন্দী করলাম।

অলক বললে—তোমার যদি কষ্ট হয় ত তুমি যাও। আমি কিছু বলব না।

তনিমা ঘাড় নেড়ে শুধু অলকের কাছে নয়, নিজেরও হৃদয়ের একটা দুর্দমনীয় বাসনার কাছে প্রাণপণে নিজের অনিচ্ছা জ্ঞাপন করে বললে—না—না—না।

অলক বের হয়ে যাবার পর অন্যদিন তনিমা তার সাজসজ্জা ও প্রসাধন নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আজ আর সে সব কিছু না করে ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ারের ওপর চুপ করে বসে বসে আকাশ-পাতাল কি যে ভাবতে লাগল সেই-ই জানে।

হেমন্তের শেষে শীত ঋতুর প্রারম্ভে দিন আজকাল একটু একটু করে ছোট হয়ে এসেছে। পশ্চিমের পড়ন্ত রোদ জানলার শার্শীতে

একটুখানি লাল আভা বিস্তার করে কখন সরে গেছে ; অন্ধকার তখনও ঠিক নেমে আসেনি, অথচ দিনান্তের সূর্য অস্ত গেছে।

অন্যদিন যে সময় অলকের বাড়ী ফিররার কথা, সেদিন যেন তার চেয়েও দেরি করে সে বাড়ী ফিরল। তনিমা অনেকক্ষণ থেকেই বারেবারে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। সদর দরজায় মোটর থামবার শব্দ হতেই সে তার হাতের বইখানা বন্ধ করে খাট থেকে নেমে উদ্গ্রীব হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

অলক ঘরে ঢুকতেই তনিমা তার মুখের দিকে তাকিয়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। মাথার চুল উস্কো-খুস্কো, গলার টাইটা বেঁকে অন্য জায়গায় গিয়ে পড়েছে, জামাটাও ঠিক তেমনি—এক ঘরের বোতাম অন্য ঘরে লগোনো হয়েছে, চোখ দুটো লাল। কারও সঙ্গে যেন মারামারি করে যুদ্ধে পরাস্ত সৈনিকের মত অপমানে ক্ষুব্ধ বিষণ্ন মুখ।

সবিস্ময়ে তনিমা তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—একি !

অলক একদৃষ্টে তনিমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। চোখে তার হিংস্র ক্রূর দৃষ্টি। বহু আগের সেই উন্মত্ত অলক যেন আবার ফিরে এসেছে।

—হ্যাঁ, এই। বলে অলক তার কম্পিত হাত বাড়িয়ে তনিমার কাঁধের কাপড়টা দৃঢ় মুষ্টিতে জোর করে চেপে ধরল। তারপর কাঁপতে-কাঁপতে বিস্ফারিত চোখ দুটিকে তনিমার মুখের কাছে এগিয়ে এনে ঠিক যেন সন্ধানী আলো ফেলে তার মুখের ওপর কি যেন অনুসন্ধান করতে লাগল।

মুখে মদের দুর্গন্ধ। অলক মদ খেয়েছ।

তনিমা বিরক্ত হয়ে একখানা হাত দিয়ে তাকে একটু দূরে সরিয়ে দিয়ে বললে—তুমি মদ খেয়ে এসেছ ? এতদিন পরে—আবার ? ছি।

দৃঢ়কণ্ঠে অলক বললে—হ্যাঁ খেয়েছি। তুমিই খাইয়েছ তনিমা, শোনো ! বলে নির্দয় নিষ্ঠুরের মত জোর করে তার কাপড় ধরে টানতে-

টানতে তাকে একটা চেয়ারের ওপর বসিয়ে, নিজেও তার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে দুই হাত দিয়ে তার হাত দুটো ধরে খুব জোরে ঝাঁকানি দিয়ে ক্ষুব্ধ ব্যথিতকণ্ঠে উন্মাদের মত চীৎকার করে উঠল তনিমা। তুমি ! তুমি ! উঃ ! বলে দুর্দ্দমনীয় কিসের যেন একটা শ্বাসরোধকারী বেদনায় বিচলিত হয়ে ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলে হাঁপাতে লাগল।

এতক্ষণে তনিমা বুঝলো সে যা ভয় করেছিল হয়ত-বা তাই ঘটেছে। নীরবে মাথা নীচু করে সে চুপ করে বসে রইলো।

কিছুক্ষণ পরে অলক যেন আবার ক্ষেপে উঠল।—তনিমা ! তনিমা !

কিন্তু এবার তার আর্দ্রসিক্ত কণ্ঠস্বর যেন অসহ্য বেদনায় ভেঙে পড়তে চায়।

তনিমা মুখ তুলে চাইলো। দেখলে, দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর তার ধারা নেমে এসেছে, ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছে, মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। এবার ধীরে ধীরে অলক তার চেয়ারটাকে টেনে তনিমার একান্ত সন্নিকটে এগিয়ে এলো। যে হাত দিয়ে এই কিছুক্ষণ আগে সে তনিমাকে ঝাঁকানি দিয়েছে সেই হাত দুটো—বাড়িয়ে তনিমাকে আবার সে সস্নেহে আলিঙ্গন করে তার সেই কাঁদ-কাঁদ মুখখানি তনিমার বুকের ভেতর লুকিয়ে ফুলে-ফুলে কাঁদতে আরম্ভ করলে।

পুরুষ মানুষের কান্না তার ভাল লাগে না। বললে, ছিঃ ! কাঁদছো কেন ?

অলক বললে, কেন কাঁদছি জানো না ? তুমি আমাকে কাঁদাচ্ছো। ভেবেছিলাম কিছু বলবো না, মুখ বুজে সহ্য করব, কিন্তু পারছি না সহ্য করতে।

—কী সহ্য করতে পারছো না ?

অলক বললে, তোমার এই ছলনা। তোমার মন পড়ে আছে কুমারের কাছে। বীণার ছেলের অসুখ করেছে বলে আমার কাছ থেকে চলে গিয়ে কুমারের সঙ্গে তুমি রাত্রিবাস করেছ।

দৃঢ়কণ্ঠে তনিমা বললে, না। করিনি।

—করোনি?

—না।

—এখনও বলছো?

—হ্যাঁ, এখনও বলছি।

অলক ভেবেছিল—তার কান্না দেখে হয়ত সে তার কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করবে। হয়ত সে তার অপরাধ স্বীকার করবে। কিন্তু তার পরিবর্তে তনিমার এই উদ্ধত ভঙ্গী, তার এই মিথ্যাচার অলককে যেন পাগল করে তুললো।

—তবে রে। বলে অলক ঠিক উন্মাদের মত তনিমাকে দুই হাত দিয়ে সজোরে ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তার সেই ধাক্কা সামলাতে না পেরে চেয়ার শুদ্ধু তনিমা যে শক্ত সিমেণ্টর মেঝের ওপর একেবারে অতর্কিতে এমন সশব্দে উল্টে পড়বে তা সে ভাবেনি।

উঃ। বলে তনিমা চেয়ার থেকে ছিটকে দূরে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লো এবং পড়েও সে চীৎকার করে কাঁদলো না, মুখে একটি কথাও বললো না, এমন-কি অলক যে কি করছে তাও সে একবার মুখ তুলে না দেখে যেমন পড়েছিল তেমনি আধশোয়া অবস্থায় মুখ নিচু করে নীরবে পড়ে রইলো।

দাঁতে দাঁত চেপে অলক আপন মনেই বললে—ভালবাসা! ভালবাসি বলতে তোমার লজ্জা করে না? আমারই বুকের ওপর মাথা রেখে শুয়ে তুমি অন্যের কথা ভাববে আর তোমায় অন্ধের মত আদর করবো? ভালবাসি? বলতে বেশ লাগে। না?

তনিমার দিকে হঠাৎ চোখ তুলে তাকাতে গিয়ে দেখলে তার কপালে কাঁচা রক্তের দাগ। কি মনে করে অলক তার কাছে গিয়ে হেঁট হয়ে বললে—কই দেখি!

দেখলে, চোট্‌ লেগে কপালের কাছে খানিকটা জায়গা কেটে গেছে।

তারই রক্ত খানিকটা কাপড়ে লেগেছে, খানিকটা টস্‌-টস্‌ করে মেঝেতে পড়েছে।

হাত দিয়ে মুখখানি তুলে ধরে কপালের রক্তটা মুছে ফেলতে গিয়ে দেখলে তনিমা কাঁদছে। তার অশ্রু ঝরা মুখখানি মুহূর্তে অলককে সব কথা ভুলিয়ে দিলে। ভুলে গেল—সে ব্যাভিচারিণী ভুলে গেল সে তাকে প্রতারণা করেছে, ভুলে গেল তনিমা তাকে ভালবাসে না। তখুনি উঠে গিয়ে টিন্‌চার আইডিনের শিশি এনে ক্ষতস্থান বেঁধে দিলে। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে বললে—চল, শোবে চল। এখানে এমন করে বসে থাকে না।

তনিমা উঠল না। অগত্যা অলক একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কোথায় গেল তনিমা কিছু জিজ্ঞাসাও করলে না, মেঝের ওপর যেমন শুয়ে ছিল তেমনি শুয়েই রইলো। দুর্জ্ঞেয় নারীচরিত্র!

অলকের যে অমন কন্দর্পের মত চেহারা—দিনে দিনে তাও যেন ম্লান ও শীর্ণ হয়ে উঠতে লাগলো।

না খেলে চলে না বলে সে মাত্র একবার খেতে বসে, কোন কিছুতেই তার যেন স্পৃহা নেই। তনিমার সঙ্গে কথা যেটুকু না বললেই নয় সেইটুকুই বলে। বাকি অধিকাংশ সময় সে চুপ করে বসে বসে ইংরেজি নভেল পড়ে। সময় সময় সেগুলোও তার কাছে যখন বিরক্তিকর হয়ে ওঠে তখন সে তার হাতের বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিতান্ত অসময়েই বাড়ী থেকে বের হয়ে যায়।

কোথাও গিয়ে তার শান্তি নেই।

যে প্রচণ্ড বেদনার দাহ তার অন্তরের মধ্যে দিনরাত জ্বলছে তাকে নেভাবার মত কোন বস্তুই অলক খুঁজে পায় না। অথচ সে বেদনার ইতিহাস কাউকে বলবার নয়।

এক-একসময় মনে হয় তনিমাকে এখানে একা ফেলে রেখে সে বহুদূর বিদেশে পালিয়ে যায়। কিন্তু আবার ভাবে যে-তনিমা তার নিত্য ধ্যানের বস্তু, তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেও তার স্মৃতি সে মন থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারবে না। তাকেই একটিবার দেখবার জন্য আবার যদি তাকে বিদেশ থেকে ছুটে সেই নিষ্ঠুর পাষাণীর কাছে এসে দাঁড়াতে হয় ত তার চেয়ে লজ্জার কিছু নেই।

এক-একদিন এমন হয় যে অলক হয়ত তার চোখের সামনে একখানি বই খুলে ধরে পড়বার বৃথা চেষ্টা করছে। মনে তার তনিমার মুখচ্ছবি। ভাবছে তনিমা আজকাল আর বাড়ী থেকে এক পাও বের হয় না, সাজসজ্জা সে একেবারেই পরিত্যাগ করেছে, এবার হয়ত সে ফিরবে। গোপনতার গ্লানিতে এতদিন পরে অন্তর হয়ত তার ভরে গেছে। হয়ত সে অন্যায়কে অন্যায় বলে মনে-মনে চিনতে শিখেছে।

কথাটা ভাবতেও অলকের মনে যেন আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে। আবেগকম্পিত কণ্ঠে হঠাৎ হয়ত ডেকে বসে—তনিমা!

তনিমা হাসতে হাসতে ধীরে-ধীরে তার কাছে এসে দাঁড়ায়।

বলে, কি ভাগ্যিস আজ ডেকেছ। কার মুখ দেখে উঠেছি আজ কে জান!

বই থেকে মুখ তুলে অলক একবার তার দিকে তাকায়। তনিমার সেই জ্বালাময়ী বহ্নিশিখার মত রূপ আবার যেন তার মনের মধ্যে তুমুল একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করে দেয়। আদর করে ভালবাসতে গিয়ে মন তার সঙ্কুচিত হয়ে ফিরে আসে। বলে, স্যুটটা আমার চাকর কি কাচতে দিয়েছে? তুমি জানো?

মুখ ফিরিয়ে তনিমা বলে, জানি না। মনে মনে বলে—এই জন্যে ডাকলে?

অলক আজকাল মদ যেন একটু বেশি খাচ্ছে। মদ খেয়ে সে ভুলতে চাচ্ছে তার অন্তরের জ্বালা।

এক-এক সময় তার মনে হচ্ছে কুমার যদি না থাকতো, হয়ত সে তনিমাকে নিয়ে সুখী হতো।

আবার এক একসময় মনে হচ্ছে—কুমারের কি দোষ? তনিমার মত মেয়ে যদি কোনও পুরুষকে কাছে টানতে চায় তো সে পুরুষ যতই কেন না শক্ত হোক্ সে আকর্ষণ সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।

অলক যেন পাগলের মত হয়ে গেছে।

কখনও গাড়াতে করে একা একা ঘুরে বেড়ায়। কখনও-বা গাড়ী ছেড়ে দিয়ে ট্রামে চড়ে বসে।

কোথায় যাচ্ছে কিছুই সে জানে না।

সবই নিরুদ্দেশ যাত্রা।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে ট্রামে যেতে যেতে অলকের হঠাৎ নজরে পড়লো ফুটপাথ ধরে কুমার হেঁটে চলেছে।

কুমার! কুমার! বলে ডাকতে ডাকতে অলক নেমে পড়লো ট্রাম থেকে।

চলন্ত ট্রাম অনেক দূরে এসে দাঁড়িয়েছিল।

কুমারকে আর দেখতে পেলো না অলক। এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে অনেক খোঁজাখুঁজি করলে, কিন্তু কোথায় কোন্‌দিক দিয়ে যে সে অদৃশ্য হয়ে গেল—অলক বুঝতে পারলে না।

কিসের যেন একটা নিস্ফল আক্রোশে বাড়ী ফিরে এলো অলক।

কোন রকমে বাড়ীতে ঢুকে দেরাজ খুলে রিভলভারটা বের করে তার সাতটি নলের মুখে সাতটি গুলি ভরে চেয়ারের উপর বসলো।

এমন সময় ঘরে ঢুকলো তনিমা। ঈষৎ হেসে বললে—এত সকাল সকাল?

অলক চীৎকার করে উঠলো—চুপ! ওইখানে দাঁড়াও। আর এগিয়ো না।

বলেই সে রিভলভারটা উঁচিয়ে বললে—দেখেছ এটা কি?

তনিমার আপাদমস্তক শিউরে উঠলো। কিন্তু সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না। খিল্ খিল্ করে হাসতে হাসতে ছুটে এসে রিভলভারটা অলকের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বললে—খুন করবে? বেশ ত! দাঁড়াও না, অত তাড়াতাড়ি কেন?

বলেই সে রিভলভারটা টেবিলের ওপর বেশ একটু দূরে সরিয়ে রেখে আবার তেমনি করে হাসতে লাগলো। সে এক অদ্ভুত হাসি।

—ওকি, তুমি পাগল হলে নাকি?

—না, পাগল আমি এখনও হইনি। কুমারকে ধরেছিলাম, সে পালিয়ে গেল। আচ্ছা যাক, আজ আমি যেখানে পাব তাকে খুন করে এসে তারপর—

—তারপর আমাকে? তা ভাল, কিন্তু ওই অবস্থায় রাস্তায় গেলে তোমাকে যে পুলিশে ধরবে।

—ধরুক! বলে অলক উঠে দাঁড়ালো।

কিন্তু তনিমাকে সরিয়ে দিয়ে যাওয়া সহজ কথা নয়। তনিমা বললে—না, তুমি একটু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে যেতে দেবো না।

—ছাড়ো, যেতে দাও। তোমার দরদের মূল্য আমি বুঝি!

—যা বোঝো তাই বোঝো, এখন এসো আমার সঙ্গে।

ধীরে ধীরে অলককে খাটের ওপর শুইয়ে দিলে তনিমা। তার চুলে হাত বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলে।

তনিমাও কিছুক্ষণ পরে তারই পাশে দেহভার লুটিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো।

অনেক রাত হলো। ঘড়িতে দুটো বেজে গেল—তবু তনিমার ঘুম এলো না। ওদিকে অলক নির্বিবাদে ঘুমিয়েই আছে।

অবশেষে ঘুম যখন তার কিছুতেই আসে না, তখন সে অলককে জড়িয়ে ধরলো।

অলকের নেশা একটু কেটেছিল। সে তনিমার হাতে ধরে বললে—কে? তনিমা?

তনিমা বললে—তা নয় ত কি অন্য কেউ ভেবেছ?

—হুঁ।

—কিছু বলবে?

—আমি আর বেশিদিন বাঁচব না তনিমা।

—বাঁচবে না কেন?

—তুমিও জিজ্ঞাসা করছ কেন? এমন করে বাঁচা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব?

তনিমা বললে—আমি ত কিছু করিনি, কেন তুমি আমাকে এমন করে খোঁচা দাও বলতে পার?

—কিছু করনি? আমি তবু তোমায় দোষ দিই? তাতে আমি খুব সুখ পাই, না?

—না, তা হবে কেন? এক-একটা পুরুষ আছে মিছেমিছি স্ত্রীকে সন্দেহ করা যাদের রোগ। এ তোমার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত।

—না, এ বিধাতার অভিশাপ। এক-একবার ভাবি—যে আমাকে ধরা কিছুতেই দিলে না, তাকে ধরতে যাওয়ার মত ভুল আর কিছু নেই।

—ধরা আমি তোমায় দিইনি ভেবেছ?

—না তনিমা, তা দাও নি। দিলে যে কি হতো সে কল্পনার স্বর্গ আমার কল্পনাতেই রয়ে গেল। এ রকম ভাবে তোমাকে আমি চাইনি তনিমা—এতে তোমারও সুখ নেই, আমারও সুখ নেই।

তনিমা চুপ করে রইলো।

একটু পরে অলক বললে—তোমায় বলছি তনিমা, কুমারকে এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে আমি দেবোই।

তনিমার বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে উঠল। বললে—ছি, সামান্য একটা মেয়ের জন্যে তুমি খুন করবে? তার চেয়ে আমাকেই খুন করো, ঝামেলা সব চুকে যাক্!

অলক বললে—অন্য কেউ হলে তাই বোধহয় করতো তনিমা। রাগের মাথায় আমারও একবার সেই কথাই মনে হয়েছিল, কিন্তু যাক, ভগবান রক্ষা করেছেন।

—ভগবান রক্ষা করেছেন?

—তা নয় ত কি? তোমাকে যদি আমি নিজের হাতে মেরে ফেলতাম, তা অবশ্য পারব না, সে-কথা ভাবতেও আমার কষ্ট হচ্ছে—তাহলে কি হতো জানো?

—না।

—যতদিন বাঁচতাম ততদিন প্রতি মুহূর্তে শুধু তোমার এই মুখখানি আমার মনে পড়তো, আর তাই ভেবে-ভেবে আমি নির্জনে বসে কাঁদতাম। ভাবতাম বেঁচে থাকলে তুমি হয়ত একদিন আমাকে ভালবাসতেও পারতে।

তনিমা চুপ করে রইলো।

অলক বললে—ঘুমোও—এবার আমার ঘুম পাচ্ছে।

দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লো একটু পরে।

পরদিন সকাল।

জানলার পথে রোদ এসে বিছানায় পড়েছে। তারই উত্তাপ গায়ে লাগতেই তনিমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখলে বিছানায় সে একা।

অলক উঠে গেছে।

ধড়মড় করে উঠে গায়ে ভাল করে কাপড় জড়িয়ে তনিমা খাট থেকে নামতেই দেখলে, টেবিলের ওপর রিভলভারটা নেই। ঘরের দরজা খোলা। তারপর দেখলে অলকের জুতোও নেই।

তবে কি রিভলভার নিয়েই সে বেরিয়ে গেছে ?

ছি ছি, সেটা ত গত রাত্রে অনায়াসেই সে লুকিয়ে রাখতে পারতো। তনিমার মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে হলো।

তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে এসে তনিমা ডাকলে চাকরকে। বললে, বাবু কোথায় গেল রে ?

চাকরটা বললে—বাবু গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল মা-জী।

—তুই চট্ করে একটা ট্যাক্সি ডেকে দে আমাকে। যা—দৌড়ে যা এখুনি।

চাকরটা ছুটে বেরিয়ে গেল।

তনিমা জামা গায়ে দিয়ে চটি পরে নেমে এলো। ট্যাক্সি আসতেই তাতে চড়ে বসে বললে—চলো সিধা!

কুমার থাকতো তার এক বন্ধুর বাড়ী।

সেখানে পৌঁছে তনিমা দেখলে কুমার নেই—তার বন্ধুও নেই।

একটা চাকর এসে বললে—কুমারবাবু আজ সকালে চলে গেছেন। যাবার আগে একটি চিঠি দিয়ে গেছেন আপনার নামে। আমি এখুনি যাচ্ছিলুম আপনার কাছে এই চিঠি নিয়ে।

—কই দেখি।

—এই নিন। বলে একটা ভাঁজ করা কাগজ দিলে তার হাতে।

—কেউ এসেছিল তার খোঁজে? অলকবাবুকে চেনো তো?

—হ্যাঁ চিনি। তিনি তো আসেন নি।

—আচ্ছা।

তনিমা চিঠিখানা পড়ে দেখলে। তাতে লেখা—

তনিমা, বিদায়। একা তোমার কাছ থেকে নয়—সমস্ত নারীজাতির

কাছ থেকে। জীবনে বোধহয় আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। তোমার কাছ থেকে আমি পালিয়ে বাঁচলাম।

তোমাকে আমি চিনতাম। চিনতাম তোমাদের জাতিকে (নারী মাত্রেই তোমার জাতি নয়) তোমরা স্বতন্ত্র।

তোমার মত আরো ছুটি নারী নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত দিয়ে আমাকে সুযোগ দিয়ে গেছে তোমাদের চেনবার। তখন আমি ভেবেছিলাম এরপরে এ-ভুল কোন দিনই করব না আর। কিন্তু তোমার মোহ থেকে সম্পুর্ণ মুক্তিলাভ করতে পারিনি। হয়ত দূর থেকে দেখে ফিরে আসতাম। তাও তুমি দিলে না। পুরুষের সর্বনাশ করতে উন্মুখ তোমার মন আমারও কম সর্বনাশ করলে না।

আমি জানি তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই আমাকেও তুমি একদিন চরম অপমান করে দূরে ফেলে দেবে। নতুনের সন্ধানে ছুটতে তুমি কুণ্ঠিত হবে না। তোমার কাছ থেকে অবহেলা পাবার আগেই বিদায় নিলাম।

তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। বিধাতা অকাতরে রূপ, যৌবন, বুদ্ধি, সবকিছু দান করেছেন তোমাকে, কিন্তু তবু তুমি কেন এই হীন কদর্য কাজ করে ফিরবে? তোমার মহিমময়ী নারীত্বকে জাগিয়ে তুমি কি জীবনের পরিপুর্ণ আনন্দ উপভোগ করতে চাও না? কিন্তু তুমি যে পথে চলেছ তার শোচনীয় পরিণাম ভেবে দেখো। রূপ-যৌবন মানুষের চিরকাল থাকে না। তোমারও একদিন তা থাকবে না। অথচ তুমি থাকবে। সেদিন তুমি আত্মহত্যা করতে না পার ত কি নিয়ে তুমি বাঁচবে? এমনি বহু ছঃখিনী অভাগিনীর শোচনীয় পরিণাম আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

এখনও সময় আছে, এখনও তুমি নিজেকে একবার চেনবার চেষ্টা করো। আমার সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র দেহের অতি ক্ষুদ্র পরিধির চারদিকে মাথা ঠুকে তোমার সুখের সন্ধান করো না। সে সন্ধান তোমার ব্যর্থ হবে।

আমিও একদিন তোমার মতই অন্ধের জীবন যাপন করেছিলাম, বিধাতা দয়া করে আমাকে সে-পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন।

যেদিন তুমি আমার চেক্‌টা ফেরৎ দিলে সেইদিনই ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে আমার চিরদিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তারপর অলককে বিয়ে করলে দেখেও নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। তার প্রমাণ সেদিন পেলাম যেদিন তুমি গণপতির বাড়ীতে আমাকে ডেকে পাঠালে। ভাগ্যিস্ রাত্রে আসিনি। কিন্তু অলকের সামনে তুমি যেরকম অভিনয় করলে, আমার ভাল লাগল না। অলকের সঙ্গে কথা না বলেই আমি চলে এলাম। কিন্তু তোমার হাত থেকে নিস্তার পেতে হলে আমাকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে হবে। তাই অমি করছি। দৃষ্টিশক্তি আমার এমন আচ্ছন্ন ছিল যে তার দিকে ভাল করে তাকাবার অবকাশ পাইনি। সেদিন দেখলাম—তোমার বিষক্রিয়ায় তার সারা দেহমন জর্জরিত। সজল দুটি চোখে যে অভিশাপ প্রত্যক্ষ করলাম, তাকে অস্বীকার করবার সামর্থ্য আমার কোথায়? তার সে অভিশাপ, তুমি কি মনে কর—আমায় স্পর্শ করবে না? তোমাকেও না?

অলককে তোমার ভাল না লাগে, তাকে তুমি তোমার সর্ব দেহ-মন দিয়ে গ্রহণ করতে না পার, সে-কথা তার কাছে স্বীকার করে, তাকে বুঝিয়ে তোমাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন করে অন্যত্র চলে যাও। যেখানে তুমি আত্মস্থ হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, সেখানে তুমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করো। তা যদি সম্ভব না হয়ত অলককে তোমার দেহমন সর্বস্ব সমর্পণ করে প্রায়শ্চিত্ত করো।

সেদিন অলকের সঙ্গে কথা না বলার জন্য আমার অনুশোচনার অন্ত নেই। তাকে দেখে আমার মনে হয়েছে, সে তোমাকে ভালবাসে। তাকে প্রত্যাখ্যান করো না।

বিদায় বন্ধু যেখানেই থাকি, তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করব।

ইতি—

তোমার বন্ধু—কুমার

চিঠিখানা শেষ হলে দেখা গেল, তনিমার দুটি চোখ জলে ভরে এসেছে। দরজার কাছে যে চাকরটা দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে খেয়াল নেই। কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছে সে গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

গাড়ি চললো তাদের বাড়ীর দিকে। বীণা আর গণপতি যেখানে থাকে—সেইখানে।

তনিমার নির্দেশমত দেখতে-দেখতে গাড়ি গিয়ে দরজায় দাঁড়াল। অলক তখনও আসেনি। তবে কি সে অন্ধের মত কুমারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

নিচে গণপতির ঘরে কেউ নেই।

সিঁড়ির শেষ ধাপে গিয়ে দোতলারর রান্নাঘরের সুমুখে ছোট্ট ছাদটুকুর ওপর যে-দৃশ্য তনিমার নজরে পড়লো, তা থেকে সে চোখ ফেরাতে পারলে না। দেখলে গণপতি তার টুকুটুকে ফর্সা ছেলেটিকে বুকে নিয়ে পায়চারি করে করে ইংরাজী শেখাচ্ছে। বলছে, মাথার ইংরাজী কি বল্ দেখি? হেড্। পায়ের ইংরাজী লেগ্।

ছ'সাত মাসের শিশু কিছু বলতে পারছে না। সে শুধু তার সুন্দর কচি-কচি হাতদুটি নেড়ে নির্বাক বিস্ময়ে পিতার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করে খিল্-খিল্ করে হাসছে।

গণপতি বললে—শিখবিনে?

সে আরও হাসতে লাগলো।

গণপতি আবার বললে—কিরে বল কিছু।

এবার সে দুলে দুলে হাসতে লাগলো।

গণপতি বললে—ওগো বীণা, ছেলে তোমার ইংরেজী শিখবে না বলছে। ছেলে নিয়ে যাও, নইলে এই দিলাম নামিয়ে।

—হ্যাঁ-গা, রান্না করতে-করতে তোমার ছেলেকে কি করে নিই বল ত!

বলে সেই মহিমময়ী জননীমূর্তি দরজায় এসে দাঁড়ালো, তাকে যেন

আর চেনাই যায় না। সন্থ স্নান করে পিঠে একপিঠ চুল এলিয়ে দিয়েছে। ঘনঘোর অগ্নিবর্ণের লাল পাড় শাড়ি পরেছে। সর্বাঙ্গে একটি কমনীয় প্রদীপ্ত শান্ত যৌবনশ্রী।

এই কি তাদের সেই বীণা? রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে দয়া করে তনিমা যাকে এই সংসারে স্থান দিয়েছে—সেই বীণা? বীণাকে যেন আর বীণা বলে চেনবার উপায় নেই।

বীণা ঘর থেকে তাকে দেখতে পেয়েছ। কিন্তু মুখ না দেখে চিনতে পারেনি।

বললে—ও কে দাঁড়িয়ে গো, ছাখ ত!

তনিমা মুখ তুলে চাইতেই সে ছুটে এলো—কে? তনিমা? ওমা! আয় ভাই আয়। আমি বলি, কে দাঁড়িয়ে আছে।

তনিমা বললে—শরীরটা বড় খারাপ ভাই।

বলে তার ঘরে গিয়ে শূন্য বিছানার ওপরে শুয়ে পড়লো।

—কই দেখি, কি হয়েছে?

বলে বীণা ঘরে গিয়ে দেখে তনিমা কান্নার আবেগে ভেঙে-ভেঙে পড়ছে।

বীণা বললে—কাঁদছিস কেন রে! কি হয়েছে?

—আজ আমার বড় কাঁদতে ইচ্ছে করছে। বলে সে বীণাকে জড়িয়ে ধরে আরও জোরে-জোরে কাঁদতে লাগলো।

এমন সময় বাইরে পাওয়া গেল অলকের গলার আওয়াজ।

অলক ঘরে ঢুকলো। বীণা তখন ঘোমটা টেনে একটু সরে দাঁড়ালো।

বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে তনিমা কাঁদছিল। মুখ তুলে তনিমা একবার তাকিয়েও দেখলে না। জুতোর শব্দে অনুভব করলো যে স্বামী তার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

তেমনি শুয়ে-শুয়েই কুমারের চিঠিখানি সে তার জামার নিচে

হাত ঢুকিয়ে বের করলে। চিঠিসমেত কম্পিত হাতখানি সে আজ এতদিন পরে অসঙ্কোচে তার স্বামীর দিকে বাড়িয়ে দিলে।

হেঁট হয়ে চিঠিখানি তুলে নিতে গিয়ে অলক দেখলে—তার প্রিয়তমা তনিমার প্রসারিত হস্তের চম্পক অঙ্গুলিগুলি ভাষাহীন আত্মনিবেদনের মৌন ইঙ্গিতের মত থর-থর করে তখনও কাঁপছে।

॥ সমাপ্ত ॥